

# মানুষ ও দেবতা

নসীম হিজাবী



www.banglabook.pdf.blogspot.com



সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক জ্ঞানের কুশলো

এক

শ্রাবণ মাস। সুরমা নদীতে প্রবলপ্রোতা। নদীর কিশোরী কয়েকটি ছোট নৌকা জীরবর্তী বড় বড় পাথরের সঙ্গে বধি আছে। বেগবতী নদীর প্রোতে নৌকাগুলো দুলছে। নিকটেই নদীতীরে কয়েকজন মাঝি জিজ্ঞেসের মতো কপালবর্তা বলাবলি করছে। একজন বুড়ো মাঝি কপালে হাত রেখে বিশাল নদীর উপর জীরের দিকে একবার দেখে পিছন ফিরে জটনৈক সুদর্শন যুবককে জিজ্ঞেস করল, “মহারাজ! সেনাপতিজী কি আজই আসবেন?”

সামরিক পোশাক পরিহিত সুদর্শন যুবককে একজন অফিসার মনে হচ্ছিল। সে জবাবে বলল, “হ্যাঁ, তিনি সম্ভবত এখনই এসে যাবেন।”

বুড়ো মাঝি বলল, “মহারাজ! আপনি তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন, এ খরপ্রোতা নদীতে নৌকা চালানো খুবই বিপজ্জনক। দুদিন অপেক্ষা করলেই চলের জল কমে যাবে। আর তখন নিরাপদে পাড়ি দেয়া সম্ভব হবে।”

যুবক বলল, “তুমি সেনাপতি সুখসেবকে জান না। তিনি কখনও সামান্য বিপদ আপদের ভয়ে মত পরিবর্তন করেন না।”

যুবকের নাম রামদাস। পুরস চব্বিশ বছর হলেও তাকে দেখতে আঠারো বছরের ছেলেমানুষ মনে হতো। হাসিহাসি মুখ এবং আকর্ষণীয় দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী রামদাস খুবই ঠিকানা। সে বুড়ো মাঝিকে জিজ্ঞেস করল, “তুমি এখাট থেকে কখনও নদী পাড়ি দাও নি?”

বুড়ো মাঝি বলল, “মহারাজ! আমাদের বাপ-দাদাও এখাটে কখনো আসেনি।”

বুড়ো মাঝি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। একজন মাঝি চেঁচিয়ে বলল, “সেনাপতিজী এসেগেলেন।”

রামদাস ও বুড়ো মাঝি ফিরে দাঁড়াল। মহারাজার সেনাপতি সুখসেব একটি ছাই

রংয়ের সুন্দর খোড়ায় চড়ে এসে পৌঁছল। তার পেছনে প্রায় চারশো পদাতিক সৈন্য দু'সারিতে ভর্তি হয়ে পায়ে হেঁটে চলে এলো।

সুখদেব নিকটে এসে খোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল। বুড়া মাঝিও সঙ্গে সেনাপতিকে প্রণাম করল।

সুখদেব মাঝিদের সরদারকে ডাকলো। বুড়া মাঝি খোড়ার বাগ জন্য একজন মাঝিকে ধরতে দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে সেনাপতিকে দূর থেকেই প্রণাম করল। সুখদেবের প্রশ্নের জবাবে মাঝি জানাল, ঘাটে সাতটি নৌকা আছে। তবে একটি নৌকা জলের নীচে নুকোনো পাথরের থাকায় কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রতি নৌকায় চল্লিশ জন করে সৈনিক যেতে পারবে। বুড়া মাঝি আরও বলল, নদী খুব খরস্রোতের। ওপারে একটি মাত্র সংকীর্ণ ঘাটে নৌকা তিড়ানো যায়। তাছাড়া এদিক-ওদিকে বড় বড় পাথর রয়েছে। এখন চলার প্রাবনে ঘাট-অঘাট ঠিক করাই নয়। স্রোতের থাকায় যদি নৌকা ঘাট ছাড়িয়ে যায়, তাহলে পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ডুবে যাবার আশংকা। বুড়া মাঝি তাই দু'তিনদিন পর প্রাবন কমে গেলে পাড়ি দেবার অনুরোধ জানাল।

সুখদেব সেনাপতির পদে পদোন্নতি লাভ করেছিল মাত্র বিশ দিন আগে। নদীর ওপারে পাহাড়ী এলাকার অধ্বুদের শাস্তা করার জন্য মহারাজ তাকে মাত্র বিশ দিনের সময় দিয়েছেন। নদীতীরে পৌঁছতে পৌঁছতেই তার দু'দিন কেটে গেছে। তাই তার পক্ষে বিলম্ব করা চলে না। রাজদরবারে তার প্রতিদ্বন্দ্বী গঙ্গারাম সেনাপতির পদ না পেয়ে খুবই কুপিত। সুখদেব নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সমাধা করতে অসমর্থ হলে গঙ্গারাম মহারাজের নিকট সুখদেবের অযোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য অতি মাত্রায় উৎসাহী হয়ে উঠবে। সুখদেব তাই বুড়া মাঝিকে বলল, "না, আমার জো বিলম্ব করার যো নেই। আজই নদী পাড়ি দিতে হবে।"

বুড়া মাঝি করজোড়ে বলল, "মহারাজ! আমাদের জন্য নয়। আমরা কয় পয়সা দামের মানুষ! আপনার এবং সৈনিকদের সৈনিকগণের জীবন অতি মূল্যবান। আপনারা সৈনিকদের সকলের মঙ্গল চিন্তা করেই আশি দু'দিন অপেক্ষা করার জন্য আবেদন করছি। এ সময়ে নদী পাড়ি দেয়া খুবই বিপজ্জনক। রাজপুরুষেরা অতীতে শুধু শীতকালেই নদীতে পাড়ি দিতেন।"

সুখদেব ধমকের সুয়ে বলল, "তুমি বেশী কথা বলছ মাঝি। ওপারের বন্য লোকগুলি শীতকালে আমাদের আক্রমণের ভয়ে সতর্ক থাকে। একটু টের পেলেই খরস্রোতের মত ছুটে গভীর জংগলে প্রাণিয়ে যায়। বর্ষাকালে এরা আক্রমণের আশংকা করে না। তাই অসতর্ক থাকে। এসময় ওখানে পৌঁছে ওদের সকলকেই প্রেরণার সন্ত্রাস সহজ হবে। আমি আর বেশী কথা শুনতে চাইনে। পাড়ি দেবার জন্য তৈরী হয়ে যাও।"

বুড়া মাঝি বলল, "মহারাজ! আপনার হুকুম মেনে চলাই আমাদের কাজ। যদি অনুমতি দেন তবে একটি নিবেদন আছে। বুড়া মানুষের একটি কথা শুনলে আপনার ক্ষতি হবেনা।"

সুখদেব অনুমতি দিলে বুড়ো মাঝি বলল, "মহারাজ! সকলে এক সঙ্গে পাড়ি না দিয়ে একটি নৌকায় বিশ জন সৈন্যকে প্রথমে যেতে দিন। যারা ভাল সাঁতার কাটতে জানে, তাদেরই প্রথম দফা যেতে দিলে ভাল হয়। যদি দেবতাদের ইচ্ছায় নৌকাটি মঙ্গল মত ওপারে পৌঁছে যায়, তাহলে অন্য নৌকাগুলি সকলকে নিয়ে এক সঙ্গে পাড়ি দেবে।"

সুখদেব বুড়ো মাঝির এ প্রস্তাব পছন্দ করল। সে রামদাসকে হুকুম দিলো, "বিশজন ভাল ভাল সিপাই বাছাই কর। তারা আমার সঙ্গে প্রথম নৌকায় যাবে। আমি ওপারে পৌঁছে যাবার পর তুমি সকলকে নিয়ে একসঙ্গে পাড়ি দেবে।"

রামদাস একটু আপত্তি জানিয়ে বলল যে, প্রথম সেনাপতিজীর স্বাস্থ্য ঠিক হবে না। দৈবচক্রে কোন দুর্ঘটনা হয়ে গেলে, সেনাপতিরই জীবন লক্ষ্য হবার আশংকা। সেনাপতির পরিবর্তে প্রথম নৌকায় রামদাস নিজেই যাবার অনুমতি চাইল।

সুখদেব দৃঢ়ভাবে বলল, "না, রামদাস। প্রথম নৌকায় আমি যাব। যদি দুর্ঘটনায় আমি মারা যাই, তাহলে গঙ্গারাম আমাকে জনভিজ্ঞ বলতে পারবে, কিন্তু কাপুরুষ বলতে পারবেনা।"

সুখদেব কুড়িজন বাছাই করা সৈন্যসহ নৌকায় উঠলে বুড়ো মাঝি তিনজন সহকারী নিয়ে নোঙর তুলে দিল। প্রবল স্রোতের মুখে নৌকার লক্ষ্য ঠিক রাখাই অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠল। স্রোতের টানে নৌকা অসামঞ্জিক চলে যেতে লাগল। মাঝিগণ গলদঘর্ষ হয়ে মাঝ নদী পর্যন্ত পৌঁছল। সেখানে স্রোতের বেগ আরও বেশী। বৈঠা টেনে টেনে মাঝিদের হাত পা অসাড় হয়ে এসেছিল। মাঝ নদীর বেগবান স্রোতের মুখে তারা কিছুতেই নৌকা ঘাটমুখী করতে পারল না। মাঝিদের প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে নৌকা স্রোতের টানে ভাট্টির দিকে যেতে শুরু করল। বুড়ো মাঝি হাঁকি ডাক করে তার সঙ্গীদের নানা নির্দেশ দিচ্ছিল। কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও নৌকাটি পানির নীচে লুকোনো একটা বিশাল পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকার তলা ফেটে পানি উঠতে শুরু করল। মাঝি ও সৈনিকগণ টাংকার ও হৈ চৈ করে নদীর মধ্যে পড়ে গেল। স্রোতের টানে কে কোথায় গেল, তার কোন হদিস রইল না। সুখদেব ভাল সাঁতার কাটতে জানতো। বেশ কিছু সময় সাঁতার কাটার পর তার হাত পা অবশ হয়ে এলো। বাধ্য হয়েই নিজেই স্রোতের মধ্যে ছেড়ে দিল।

## দুই

সুখদেবের জ্ঞান ফিরে এলে সে কতকগুলো অপরিচিত গলার স্বর শুনতে শেলো। চোখ খুলে তার চারদিকে কয়েকজন অপরিচিত মানুষ দেখতে পেয়ে পুনরায় সে চোখ বন্ধ করল। মুহূর্তের মধ্যে আগের ঘটনাবলী তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। মনে তার প্রবল জাগল, “আমি কি সত্যি বেঁচে আছি?” ভাবতেই তার চোখের পাতা খুলে গেল। অসহায় দৃষ্টিতে সে অপরিচিত মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে রইল।

কয়েকটি মুহূর্ত অতিক্রান্ত হতেই সুখদেব অনুভব করল, ঘরটির সে হত্যা ও বন্দী করার জন্য এসেছিল, তাদেরই মাঝখানে এখন সে নেহায়েত অসহায় ও দুর্নশায়ক অবস্থায় শুয়ে রয়েছে। আরও অবাধ হয়ে লক্ষ্য করল যে, এই লোকগুলোর চেহারা যুগ্ম বা আক্রোশের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। উপরন্তু তার প্রতি তাদের সমবেদনার মনোভাবই দেখা যাচ্ছে। তার ‘ন্যায়-পরায়ণ’ মহারাজা ও পুরোহিত ঠাকুর এ লোকগুলোর ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাদের ফসলতরা ক্ষেতগুলো থেকে বিতাড়িত করার জন্যই ছিল তার এ অভিযান। এ লোকদের মুখ দেখা, এদের সঙ্গে বাক্যালাপ করা, এদের গলার স্বর শোনা কিংবা এদেরকে স্পর্শ করাও জঘন্যতম পাপ। সমাজের আইন এদেরকে অক্ষুণ্ণ ঘোষণা করেছে। অক্ষুণ্ণদের প্রতি অত্যাচার করা বর্ণ হিন্দুদের অন্যতম অধিকার।

আজ সুখদেব তাদেরই দয়ার উপর নির্ভরশীল। একটি স্তীর্ণ কুটিরে ময়লা পুরাতন ছিন্ন বিছানায় সে শুয়ে আছে। সে তাদের গলার আওয়াজ শুনেছে, তাদের চেহারা দেখেছে এবং তাদের ছোঁয়া বিছানায় শয়ন করেছে। ধর্মহ্যাত হতে তার আর কিছুই বাকী নেই। সমাজের ভয়ে সুখদেবের অন্তর কেঁপে উঠল। অথচ এখান থেকে ছুটে পালিয়ে যাবার তার শক্তি নাই। চারদিকের লোকগুলো তার সম্পর্কে নানা কথা কলাবলি করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি যুবক ছুটে এসে বলল, “রাস্তা পরিষ্কার কর। সরদার আসছে।”

নির্দেশ পাওয়া মাত্র লোকগুলো কুটিরের এককোণে চলে গেল। একজন বুড়ো লোক লাঠি তুলে করে কুটিরে এসে প্রবেশ করল। তার সঙ্গে ছিল একটি লম্বাচড়া সুন্দরী যুবতী। সরদার সুখদেবের নিকট বসে তাকে মনোযোগ সহকারে দেখল। সুখদেব যুগ্মের অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

সরদার ক্রিজেন্স করল, “আপনার পরিচয়?”

সুখদেব অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়েই রেখেছিল। কোন জবাব দিল না।

সরদার আবার বলল, “আপনাকে দেখে তো বেশ উচু-জাতের সৈনিক মনে হয়।

আপনি এখানে কি করে এলেন?"

সুখদেব নীরব থাকায় অন্য একজন বলল, "মহারাজ! ইনি নদীতে ডুবে যাচ্ছিলেন। আমরা অনেক কষ্টে তাকে তুলে এনেছি।"

সরদার বললো, "খুব ভাল করেছে।"

সরদার আবার সুখদেবকে লক্ষ্য করে বলল, "আপনি নিশ্চিত থাকুন। খুব দক্ষ হয়ে পড়েছেন বলে মনে হয়। কাল সকাল পর্যন্ত আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। নদীর তীরে নেমে গেলেই আমরা আপনাকে ওপারে পাঠিয়ে দেব।"

সুখদেবের চিন্তাক্রান্ত চেহারায় এবার স্বস্তির আভাস ফুটে উঠল। তাকে, এতদিন যাবৎ এদের নিষ্ঠুর ও অমানুষিক আচরণের যে হাজার হাজার কাহিনী শুনে এসেছি, তা কি তাহলে মিথ্যা? শৈশব থেকেই সে শুনে এসেছে, বুনো-কুকুরগোষ্ঠী মানবতা বর্জিত। ময়ামায়ার কোন লেশ মাত্র নেই ওদের প্রাণে। বর্ণ-প্রভেদকে পেলেই ইতর প্রাণীর মত ওরা হত্যা করে। কিন্তু কী আশ্চর্য! সরদারের কথাসমূহের মধ্যে কেমন মমত্ববোধ ফুটে উঠেছে। সুখদেবের মনে আর একটি চিন্তা জাগে উঠল। হয়ত বা এরা তাকে হত্যা করার জন্যই তার মনে বেঁচে থাকার অশা জ্বালিয়ে তুলতে চাইছে। সুখদেব সকলের মুখের দিকে একবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে যখন যুবতীর দিকে তাকাল, তখন তার দৃষ্টি সেখানেই স্থির হয়ে রইল।

অপবিত্র, দরিদ্র ও সহায়-সমর্থহীন সমাজের শরীর মতন এ মেয়েটি জন্মাল কী করে? তার পরিধানের কাপড় পরিকার-পরিকার। মুখমন্ডলে উবার রক্তিম আলোর ঝলক। যুবতীর আকর্ষণীয় চেহারায় সুরভারী, বুদ্ধিমত্তা ও গাভীরের স্পষ্ট চিহ্ন দীপ্যমান। মজবুত ও সুগঠিত দেহে নারীসুলভ সকল লাবণ্য ফুটে আছে। যুবতীর চেহারাখানা তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে তুলে যেন তাঁর নিষ্কেপ করল। সুখদেব তার অন্তরের অন্তঃস্থলে সূক্ষ্ম সূর-লক্ষী স্তনতে পেল। পরক্ষণেই তার মনে পড়ল, সে পবিত্র সমাজের সন্তান। আর এই সুন্দরী কুমারীর দিকে সে তাকিয়ে আছে, সে অক্ষুণ্ণ সমাজের এক অপবিত্র যুবতী। সুখদেব তাড়াতাড়ি অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

সরদার বলল, "এমন কালের সময় আপনি নদীতে নাবতে গেলেন কেন? বোধহয় ভাল সাঁতার কাটতে পারেন। তা না হলে উঁচু জাতের লোকেরা তো সাধারণত এ মণ্ডসূমে নদী থেকে দূরেই থাকে।"

সুখদেব বুড়ো-সরদারের দিকে তাকাল। মন বলছে। বুড়োর সঙ্গে তার আলাপ করা উচিত। কিন্তু মুখে তার তাবা যোগাচ্ছে না। সরদার গ্রেহ তরা ষরে বলল, "আপনি এত চিন্তিত হচ্ছেন কেন? সাহস সঞ্চয় করুন। এখানে আপনার কোন দূশমন নেই। আপনার মহারাজার সৈনিকেরা আমাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে আমাদের সহায় সম্পদ লুণ্ঠন করে আমাদেরকে গোলাম বানানোর উদ্দেশ্যে এখানে স্তম্ভাগমন করেছে। সেসব তো অনেক দিন আগের কথা। এখন আপনিই প্রথম অতিথি হিসাবে আমাদের এখানে আপনার পবিত্র চরণ রেখেছেন। যদিও আপনার উপযুক্ত সেবায়ত্ত করার মত শক্তি

আমাদের নেই, তবু আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন, আপনার চরণের সেবা করার জন্য আমরা আমাদের সবকিছু লুটিয়ে দিতে কোনই ত্রুটি করব না।”

সরদার উপস্থিত লোকদের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি যা’ যা’ বললাম, তা তোমরা সত্য বলে প্রমাণিত করবে—এটাই আমি আশা করি।”

একথা বলে সরদার এগিয়ে গিয়ে সুখদেবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। সুখদেব আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছিল, সরদার তাকে “তুমি” না বলে “আপনি” সম্বোধন করছে। সে তার অন্তরে একটা ভারী বোঝার চাপ অনুভব করতে লাগল। তার মনে হল এ কুটিরের প্রতিটি শুকনো পাতা তাকে ঘূর্ণার চোখে দেখছে। ইচ্ছা হচ্ছে ছুটে গিয়ে নদীতেই ঝপিয়ে পড়তে। কিন্তু শরীরে শক্তি নেই। সুখদেব চঞ্চল হয়ে উঠে বসল। সরদারের দেখাদেখি উপস্থিত সকলেই একের পর এক সুখদেবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। কিন্তু তাদের হাতের ছোঁয়া সুখদেবের নিকট স্থলভ অঙ্গার হল। তার বিবেক বলে উঠল, “হায়! এ বুড়ো সরদার যদি আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করার পরিবর্তে খঞ্জরের খোঁচায় আমাকে টুকরো টুকরো করে দেবার জন্য তার লোকদের স্তুতি দিত, তাহলেই অনেক ভাল হ’ত।”

সকলের পর সরদার যুবতীকে লক্ষ্য করে বলল, “মা কমল! কী চিন্তা করছ? অতিথির সম্মান করা আমাদের সব চেয়ে বড় কর্তব্য।”

যুবতী সংকোচে উঠে দাঁড়াল। লজ্জা, সংকোচে ও ভয় মেশানো এক অদ্ভুত হাসি হেসে সে সুখদেবের দিকে তাকাল এবং নতুন করে হয়ে তার পায়ে হাত রাখল। প্রণাম শেষ করে আবার ধীরে ধীরে পিছু হটে অরুণিতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মুহূর্ত কালের জন্য তার সারা দেহের রক্ত যেন মুখ-মস্তক জমা হয়ে গিয়েছিল। মুখে তার সাদা ও লাল আভা প্রফুল্লিত হতে লাগল। সুখদেবের হৃদয় থেকে মস্তিক পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল। কিন্তু তবু সমাজের এই উচ্চশ্রেণীর আত্মপর্বাঁ যুবক নিজের মনের দুর্গতা বাইরে প্রকাশ পেতে নিসর্গ।

সরদার তার লোকজনকে প্রস্থান থেকে চলে যেতে আদেশ দিল। মাত্র অল্প কয়েকজনকে রাত জেগে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে সুখদেবকে বলল, “আপনি রাজ-প্রাসাদের বাসিন্দা। আমাদের এসব শীর্ণ কুটিরে অবশ্যই আপনার কষ্ট হবে। অনুমতি দিলে আপনার খাটিয়াটি বাইরে নিয়ে যেতে পারি। মেঘ কেটে গেছে। বাইরে ঠান্ডা হাওয়ায় আপনি খাটিয়ায় ঘুমুতে পারবেন।”

সুখদেব বাইরে চলে গেলে একজন লোক তার খাটিয়াটি সাজিয়ে নিয়ে গেল। সরদার বলল, “আপনি বিশ্রাম করুন। আমার এ লোকেরা আপনার সেবাযত্নের জন্য এখানে রইবে। আমি এখন যাচ্ছি। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে দয়া করে আমার এ লোকদের কাছে বলবেন।”

সরদার কিছুদূর চলে গেলে সুখদেব তাকে ডেকে বলল, “সরদারমহী! আমার চারখানি-আসব লোক পাহারায় দাড়িয়ে থাকলে আমি তো ঘুমুতে পারব না। আপনাকে

নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমি পালাতে চেষ্টা করব না। আমাদের এখন একা থাকতে দিলে ভাল হয়।”

সরদার ফিরে এসে বলল, “আপনি যদি চলে যেতে চান, তাহলে কেউ আপনাকে বাধা দেবে না। নদীতে চল না এলে আমি নিজে আপনাকে গুপারে পৌঁছে দিতাম। আপনি কেন ভাবছেন যে, আপনি আমাদের কয়েদী? আপনি শহরের বাসিন্দা। এ বন জংগলে একাকী আপনি অস্তিত্ব বোধ করতে পারেন মনে করে আমি গুদের পাহারায় লাগিয়েছি।”

সুখদেব বললেন, “না না, পাহারার দরকার নেই। দয়া করে আঁশরি গুদের চলে যাবার হুকুম দিন।”

সরদারের নির্দেশ শেয়ে বাকীরাও সবাই চলে গেল। সরদার বলল, “আপনি হুকুম দিলেই গুরা চলে যেতো। গুদেরও অস্তিত্ব সেবার যথেষ্ট আশঙ্কা তাহাজ্জা আপনার মত অস্তিত্বের চরণ সেবার সুযোগ তো সহজে আসে না।” সরদার একটা কথাটি বলে নিজেও বাড়ীর দিকে রওনা হল।

### তিন

সরদারের নাম সাধন। তার এলাকার সামান্য কিছু অংশ সমতল ভূমি এবং বেশীর ভাগই পাহাড়। এ অঞ্চলে কয়েকটি পাহাড়ী গোত্রের বাসস্থান। পূর্বে তারা সিলেটের সমতল এলাকায় বাস করত। উত্তর ভারত থেকে আগত আর্ষণ্য বারবার আক্রমণ চালিয়ে তাদের জমিজমা কেড়ে নিয়ে পাহাড় ও জংগলে তাড়িয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, আর্ষণ্য দেশের আদিম বাসিন্দাদের অক্ষুণ্ণ রাখা করে। যে হতভাগ্য লোকেরা বশ্যতা স্বীকার করেছিল, তাদের শূন্য আখ্যা নিয়ে সমাজের খুণ্য দাসে পরিণত করা হয়। যারা এ দাসত্বের জীবন মেনে নিতে রাজী হয়নি, তারা জৈন্তিয়া থেকে আসামের শেষ সীমায় পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে যায়। এ পাহাড়ী ও সমতল এলাকার মিলন স্থলেই বর্ণ হিন্দুদের রাজত্ব ছিল। তারা ঐ পাহাড়ী এলাকায় আক্রমণ করে অক্ষুণ্ণদের এলাকা দখল করে তাদের উপর দাসত্বের জীবন চাপিয়ে নিতে খুবই উৎসাহী হয়ে ওঠে। যে দাসতা বেশী পরিমাণ পাহাড়ী এলাকা দখল করতে পারতো, তারই তত বেশী বীরত্ব প্রমাণিত হত। বর্ণ হিন্দুগণ ঐ রাজাকে সন্মান ও সম্মানের নজরে দেখত।

সুখদেব এই ব্রহ্মই এক পাহাড়ী এলাকায় বসবাসকারী কয়েকটি গোত্রের সরদার। পাহাড়ী এলাকায় এদের স্বাধীন জীবন যাপন পার্শ্ববর্তী মহারাজার জন্য মাথা ব্যথার



কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই সাধনদেরকে শূন্য বানিয়ে নেবার জন্য তাদের চেঁচান শুরু নেই। পাহাড়ী লোকেরা তথাকথিত উঁচু জাতের লোকদের কোন ক্ষতি করে না। তারা বর্ণ হিন্দুদের রাজ্যে প্রবেশও করে না। কিন্তু ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও বর্ণ হিন্দু রাজাগণ তাদের স্বাধীন জীবন যাপন ঘোটেই পছন্দ করে না। পাহাড়ের সবুজ বনাঞ্চলে গো-মহিষাদি প্রতিপালন, আসমানের রোদ-বৃষ্টি ও মাটির উর্বরতা থেকে ফসল উৎপাদন করে নীচ জাতের লোকেরা কেন সুখে জীবন যাপন করবে? এরা দেবতাদের দৃষ্টিতে দৃশ্য জীব। পোলায়ী করার জন্যই এদের জন্য। আসমানের রোদ-বৃষ্টি, উর্বর ভূমি ও গৃহপালিত জীবজন্তু ভোগ করার একমাত্র ইজারাদারী হচ্ছে উঁচু জাতের লোকদের। তাই তারা এদের প্রতি সর্ব প্রকার অত্যাচার ও অন্যায় আচরণকে শুধু বৈধই মনে করে না, দেবদত্ত অধিকার বলেই বিবেচনা করে।

প্রতিবেশী রাজা এ পাহাড়ী এলাকা দখল করার জন্য বারবার আক্রমণ করেছে। কিন্তু ঘন অংগল এবং খাড়া পাহাড় বারবার তাদের অস্তিত্ব লুপ্ত করে দিয়েছে। তাই দশ বারো বছর যাবত মহারাজা পাহাড়ী এলাকায় কোন সৈন্য প্রেরণ করেনি। সাধন ও তার সমগোত্রীয় লোকেরা এই কয়েকটি বছর নিরুপায় কাটিয়েছে। পার্শ্ববর্তী রাজ্যে এক যুবক রাজা সিংহাসনে বসার পর বুড়ো পুরোহিত তাকে অক্ষুণ্ণ নিধনের “পবিত্র” কর্তব্য স্বরণ করিয়ে দেয়। মহারাজাও দেবতাদের সমৃষ্টি অর্জনের মানসে সুখসেবের নেতৃত্বে শূন্যদের অপবিত্র অঞ্চল দখল করার জন্য সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। যাবার পথে অক্ষুণ্ণদেরই দয়ায় বিশ্বয়কর তাবে সুখসেবের জীবন রক্ষা পায়।

সরদার নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে গিয়ে অতিথি সম্পর্কে চিন্তা করছে, ঠিক এমনি সময় তার মেয়ের কন্যা কমল জিজ্ঞেস করল, “বাবা, আজ তোমাকে এমন চিন্তিত মনে হচ্ছে কেন? কিছু খাঙ্কনা। খাবার নিয়ে আসব?”

সাধন বলল, “না মা, বিশেষ নেই। এখন কিছুই খাব না।

কমল বলল, “আচ্ছা, বাবা। অতিথির তো বিশেষ পেয়েছে। তুমি তাকে কিছু খেতে বলছ না কেন?”

সরদার বলল, “মা। তারা তো উঁচু জাতের লোক। আমাদের হাতের কোন কিছুই তারা খান না।”

“কেন, বাবা, খান না কেন?”

“তুমি জানো না মা। তাদের ধর্মই এটা নিষেধ করেছে। নিরুপায় না হলে অতিথি আমাদের খাটোরাত্তও খুঁতেন না।”

“নিরুপায় হয়ে যদি আমাদের খাটে খুঁতে পারেন, তাহলে নিরুপায় হয়ে আমাদের খাবারও খেতে পারেন।”

“অতিথি নিরুপায় হয়ে যাবেন এই ভয়ে আমি তাকে খেতে বলিনি মা।”

“এখনও তো হতে পারে, অতিথি খুব ক্ষুধার্ত, তাকে খেতে দিলে তিনি আরো সবুজ হয়ে যাবেন।”

“মা, আমাদের খাবার খেলে যে অতিথির ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। অতিথিকে ধর্মশ্রষ্ট করা মহা পাপ। তাই তিনি ক্ষুধার্ত হলেও আমি তাকে আমাদের ঘরে খেতে বলতে পারিনা।”

“যদি তিনি নিজে চেয়ে খান?”

“তাহলে তো আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি কি কখনও চাইবেন তাবছ, কমল?”

“বাবা! তিনি যতদিন আমাদের অতিথি থাকবেন, ততদিনই তিনি খেতে কাটাবেন?”

“কমল! তুমি তা নিয়ে এত তাবছ কেন? কাল সকালেই আমি তাকে নদীর ওপারে পৌঁছে দিয়ে আসব। তুমি এখন যাও, ঘুমোও গিয়ে।”

কমল নিরাশ হয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু চোখে তার কিছুতেই ঘুম এলো না। নারী স্বভাবতই মমতাময়ী। সুখদেব ক্ষুধার্ত, নিরুপায় এবং বিধব্রত। ঘরে খাবার আছে, অতিথির পেটে ক্ষুধা আছে অথচ তিনি খাবেন না। তাঁর ধর্ম তাঁকে অন্য মানুষের হাতের খাদ্য খেতে নিষেধ করে দিয়েছে। কতদিন তিনি ধর্মের নির্দেশ মান্য করে উপবাস করবেন? তাকে উপবাস করতে দেয়াটাই কি ধর্ম?

সরদার ঘুমিয়ে পড়বার পর কমল উঠে গিয়ে একটু টুকরী থেকে অনেকগুলো ভাল ভাল আম তুলে আনল। তারপর সুখদেব যে গুড়ীভক্ত কিরাম করছিল, সেখানে গিয়ে হাজির হল। সুখদেব খাটিয়ায় ছিল না। অমিগুলো তার বিছানার ওপর রেখে কমল ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেল সুখদেব তার ফেরার পথ ধরেই হেঁটে আসছে। কমলের বুক দুরু দুরু করতে লাগল। সে পথের এক পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সুখদেব নিকটে এসে কমলকে দেখে বিস্মিত হল। কিন্তু সে কমলের সঙ্গে কোন কথা না বলে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। বিছানার ওপর আমের স্তুপ দেখে সে অবাক হল। কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর সে কমলকে লক্ষ্য করে বলল, “তুমি এত কষ্ট করেছ কেন?”

কমল এক কদম সামনে এগিয়ে বলল, “আপনি অসন্তুষ্ট হতে পারেন ভয়ে আমার বাবা আপনাকে খাবার জন্য অনুরোধ করেননি। আবার তিনি নিজেও খাওয়া দাওয়া করেননি। আমি তাই ছেবেই আপনার জন্য এগুলো নিয়ে এসেছি। এগুলো গাছের ফল। আপনি অনুমতি দিলে আমি রুটি আর দুধও নিয়ে আসতে পারি।”

সুখদেব তারল। এই সরলা যুবতীর মুখ থেকে যে কথাগুলো বের হল, তা আশ্চর্য্য ব্রহ্ম দরদ শু মানবতাবোধে পরিপূর্ণ। তার কথায় কোথাও কোন কপটতা নেই। কমলের মুখের উচ্চারিত শব্দগুলো তাই তার অন্তরে তীরের মত বিধে গেল। জবাবে সে শুধু বলল, “না, না, দুধ-রুটির কোনই দরকার নেই। তুমি ঘরে গিয়ে কিরাম কর।”

কমল অনুরোধ করে বলল, “আপনি আমগুলো খেয়ে নিন। গাছের ফল খেতে আপনার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আগামী কাল হয়ত নদী পাড়ি দেয়া সম্ভব হবে না। কতদিন এখানে থাকতে হয় তারও কোন ঠিক ঠিকানা নেই। আপনি এত সময়

উপোস করে থাকবেন, সেটা হয় না।

সুখদেব এবার ভাল করে কমলের দিকে তাকাল। কমলের চোখ দু'টো যেন নীরব ভাষায় বলছিল "সুখদেব। তুমি উপোস করে রয়েছে। সেজন্যই আমি খাবার নিয়ে এসেছি।" সুখদেব অনুভব করল, "অক্ষুৎ সমাজের এ সরলপ্রাণা বালিকা ছাকে উচ্চবংশের লোক বিবেচনা করে পূজা করতে আসেনি। বরং তার দুর্দশা দেখে সাহায্য করতে এসেছে। সুখদেব কিছু না বলে আমগুলো একপাশে সরিয়ে নিয়ে খাটায় বসে পড়ল। কমলও নিজের বাড়ীর দিকে চলে গেল।

সুখদেব কিছুক্ষণ ধরে আমগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। নীচ জাতের যুবতীর হাত লাগা সত্ত্বেও সেগুলো থেকে সুগন্ধই বের হয়ে আসছে। আমার রক্তের ঝর্ণ এবং সুগন্ধ তার ফুঁখা যেন আরও বাড়িয়ে দিল। একটি আম উঠিয়ে সে মুগ্ধ কাছে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে সমাজের কঠোর চেহারা ভেসে উঠল। ক্রমশঃ হয়ে আমটিকে সে পুনরায় আগের জায়গায় রেখে দিল।

চল

কমল চলে গেলে সুখদেব আমার একটি উঠিয়ে নিয়ে নদীর দিকে হাঁটতে শুরু করল। সে একজন সাহসী সৈনিক। তার ও ভরবারীর ছায়ার তার জীবন গড়ে উঠেছে। দেবতাদের দূশমন এ নীচ জাতের মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করে তাদের রক্তে হোলি খেলার মনোবল তার ছিল। কিন্তু আজ এক অক্ষুৎ যুবতীর দয়ার্ত্র হৃদয়ের উপটৌকন সে ছুঁড়ে ফেলে দিতে সাহস পেল না। নদীর কিনারায় পৌঁছে সুখদেব একটি পাথরের ওপর বসেপড়ল।

তার বিবেক বদল, জেদময় অন্তরে দুর্বলতা প্রবেশ করেছে। তা না হলে ছোট জাতের একটি সামান্য বালিকার উপহার তুমি কিরিয়ে দিতে পারছ না কেন? তুমি একদিকে দেবতাদের পূজা করতে চাও, আবার দেবতাদের দূশমন ঘৃণা শূন্যদের মনোপ কষ্ট দিতে রাজী নও। তুমি দুদিক রক্ষা করবে কি করে? যাদের হত্যা করতে এবং যাদের বাকীঘর ছালিয়ে ধ্বংস করতে তুমি এসেছিলে, তাদের মানবোচিত ব্যবহার, ভয়ভীতি ও সেবার তুমি লঙ্ঘিত হয়েছে। অথচ বংশ পৌরবের দরুন তুমি তা স্বীকার করছ না। আমগুলো ছুঁড়ে ফেলে নিয়ে সমাজে ফিরে গেলেই কি তোমার পূর্ব-মানসি অক্ষুৎ থাকবে? তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত আজ অপবিত্র হয়ে পড়েছে। তুমি এতদিন সমাজ নামক একটা শেকলের শক্ত আঁটি ছিলে। কিন্তু আজ তোমার সে

অবস্থা আর নেই। মহারাজা ও পূজারী ঠাকুরের নির্দেশে এখন ভূমি আর নির্বিচারে ছোট জাতের মানুষগুলোর রক্তপাত করতে পারবে না। শূদ্রদের মানুষ বিবেচনা করে তোমার অন্তর অপবিত্র হয়ে গেছে। ভূমি তাদের ঘাড় তরবারীর আঘাত করতে গিয়ে একশো বার চিন্তা করতে বাধ্য হবে। নীচ জাতের বুড়ো সরদার ও সরল প্রাণা একটি কুমারী নারীর কথা তোমার হৃদয়কে নরম করে ফেলেছে। ভূমি তাদের প্রতি ঠাট্টা কখনই নিষ্ঠুর হ'তে পারবে না। বরং নিষ্ঠুর আচরণের নির্দেশ পেলে তোমার মনেই বিদ্রোহ করে উঠবে।”

বিদ্রোহের কথা মনে উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুবদেব তরে কৌশল উঠল। সে অনুভব করল, এটা পাপ চিন্তা। এক অজানা শক্তি যেন তাকে দেবতার পবিত্র চরণ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দূর পাহাড়ের হতভাগ্য শূদ্রা ছুটে এসে যেন তার চরণপাশে দাঁড়িয়েছে। বুড়ো সরদার ও তার যুবতী কন্যা এগিয়ে এসে সুবদেবের হাত ধরে বলে, “বল, আমাদের কি অপরাধ? তোমরা আমাদের কি ক্ষমা চুপা কর? তোমরা কি কারণে আমাদের রক্ত পান করতে চাও?” সুবদেবের মনে হল সে যেন হাজার হাজার নির্ধারিত মানুষের মাঝখানে অপরাধী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তার বিবেকের এক কোণ থেকে আওয়াজ উঠল, “সুবদেব সাবধান! ভূমি ধর্মচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য তোমার মনে শঙ্কিত কর।”

সুবদেব নিজের মনের দুর্বলতা দূর করার জন্য আপনমনে বলে উঠল। “না না, ছোট-জাতের লোকদের সঙ্গে আমার কোন সংসর্গ নেই। দেবতা তাদের বর্জন করেছে। তাদের প্রতি দরদ দেখানো মহাপাপ।”

তার মনে সাহস ফিরে এল। সে মনে করল, দূরে নদীর উপর দিয়ে ছোট দেবতা তাকে যেন উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্য এগিয়ে আসছে। পুটুলি ঝুলে একটি আম সে নদীতে ছুঁড়ে মারল। আম টুপ করে একটা শব্দ করে ডেউয়ের নীচে ভলিয়ে গেল। সে অনুভব করল, আমটি যেন তাকে নিবোধ বলে গালি দিয়ে গেল। তার মনে হল, স্রোতোস্বতী নদী, আকাশের তীব্র, পেছনের পাহাড়, সবাই যেন তার নিবুদ্ধিতা দেখে বিদূষ করছে। যে দেবতা নদীর উপর দিয়ে ছোট কিছুক্ষণ আগে তাকে উদ্ধার করতে আসছিল, সে ফিরে গিয়ে স্বপ্নের স্তরে পড়েছে। সুবদেব নদীর কিনারায় একা একা দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগল। তার কানে কমলের কণ্ঠস্বর বার বার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

“আপনি রাগ করতে পারেন, এই তরে বাবা আপনাকে খাবার জন্য অনুরোধ করেননি। তিনি শ্রীক্ষেপে কিছু খাননি। আমি তাই ভেবেই আপনার জন্য এই ফলগুলো নিয়ে এসেছি।”

“আপনি ফলগুলো খেয়ে নিন। গাছের ফল খেতে আপনার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।”

“আপনি এত সময় উপোস করে থাকবেন, সেটা হয় না।”

সুখদেব গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। ভাবল, "পাছের আম। অঙ্কুতেরা তো এ ফলের সৃষ্টা নয়। তাহলে কুথায় কষ্ট করা কেন?"

সুখদেব একটি আমের ছাল তুলে মিষ্টিরস মুখে দিল। সে আমটি খেয়ে লক্ষ্য করল, অঙ্কুৎ যুবতীর হেঁচো লাগা সত্ত্বেও আমের মিষ্টতা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি।। একে একে সবগুলো আম খেয়ে সে আটি ও ছাল হাতে তুলে নিল এবং তার খাটিরার লম্বা রেখে দিল।

## পাঁচ

উঁচু উঁচু পাহাড়ের আড়াল থেকে সূর্য বেগ হয়ে এল। সুখদেব চোখ খুলতেই দেখতে পেল বুড়ো সরদার নিকটেই একটি খাটিরার উপর বসে রয়েছে। কয়েকজন পাহাড়ী মানুষ নীচে ঘাসের উপর বসে সুখদেবের ক্ষেত্র ভাঙার জন্য অপেক্ষা করছে। সরদার উঠে এসে সুখদেবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করার জন্য ব্যস্ত বাড়াতেই সুখদেব তার হাত ধরে পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে সরদারের সামনে দিয়ে দাড়াইল। বলল, "আপনি আমাকে আর লক্ষ্য দেবেননা।"

সরদার জবাবে বলল, "আপনি আমার প্রতিধি। আপনার সেবা করা আমার কর্তব্য।"

"না, আমি আপনার নিকট অপরাধী। আমার অপরাধ খুবই জঘন্য। আপনি যে ধরণের তত্ত্ব ব্যবহার করছেন তার উপযুক্ত কৃতি আমি নই।"

"ছিঃ ছিঃ এমন কথা বলবেন না। আপনি আমাদের দেবতা।"

"সেটাই আমার দুর্ভাগ্য। দেবতা না হয়ে যদি আপনার মত মানুষ হতে পারতাম, তাহলেই আমার জীবন ধনা হতো।"

সরদার চঞ্চল হয়ে বলে উঠল, "আপনি এসব কি বলছেন?"

"আমি সত্যকথাই বলছি। আমি দেবতা নই। মহারাজার একজন সৈনিক মাত্র। আমি যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলাম, তা যদি আপনি জানতেন, তাহলে অবশ্যই আমার সঙ্গে এমন উদার ব্যবহার করতে পারতেন না। শুনুন। যদি নদীর ঢল আমাকে অসহায় অবস্থায় এখানে সাঁ পৌঁছাতো, তাহলে আপনারা আজ আমাদের হাতে বন্দী হতেন। আপনাদের প্রতি নিষ্ঠুরতম আচরণ করা হতো। আমি আপনাদের কুটিরগুলো জ্বালিয়ে দিতাম। আপনার পশু এবং চারণভূমি এতক্ষণে আমাদের দখলে এসে যেতো। বলুন, এখনও কি আমাকে আপনি দেবতা মনে করেন?"

সরদার বলল, "যদি আপনারা আমাদের তাক্সা কুটির, পশু ও চারণভূমিগুলো দখল

করতে চান, তাহলে আমরা বেঞ্চের এগুলো ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে রাজী আছি।  
এতবড় দুনিয়া। এর মধ্যে চারণ ভূমি খুঁজে নিতে আমাদের মোটেই কষ্ট হবে না। ঘাস  
পাতা দিয়ে কুড়ের তৈরী করাও কঠিন কাজ নয়। সেজন্য যুদ্ধ বিগ্রহ ও রক্তসিক্ত  
কি প্রয়োজন ?”

সুখদেব তাবাবেগে অভিভূত হয়ে বলল, “ভগবানের দোহাই! আমাকে আর লজ্জা  
দেবেন না। আমি এতদিন মানুষ নামেরও অযোগ্য ছিলাম। আজ আপনার কাছে আমি যে  
শিক্ষা পেলাম, আমার সমাজের লোকেরা আরও একশো বছরে সে শিক্ষা পাবে না।  
আপনি মানুষ নন, সত্যিকার অর্থে আপনিই দেবতা। আমি আপনার দীর্ঘ প্রার্থনা কয়টি  
বলতে বলতে সুখদেব সরদারের সামনে নুয়ে তার পা ছুঁতে চেয়েছিলাম। মাত্রই সরদার  
সুখদেবকে ধরে আলিঙ্গন করল।

উচ্চ আর নীচ—দেবত আর অক্ষুণ্ণ—পরস্পর আলিঙ্গন করেই হয়ে অনুভব করল,  
তারা উভয়েই মানুষ। উচ্চ ও নীচের এ প্রভেদ, ঘৃণা ও বৈষম্য—ভগবানের সৃষ্টি নয়।

রোদ বেড়ে গেল। তারা দুজনে নিকটের একটি আম গাছের নীচে গিয়ে বসল। ঠিক  
সেই সময় কমল একটি মাটির পাত্র ও বাটি হাতে তারের কাছে এসে দাঁড়াল।

সরদার জিজ্ঞেস করল, “কি নিয়ে এলে, মা, কমল?”

“মুখ নিয়ে এসেছি বাবা, অতিথির জল খাবার হয়নি।”

সরদার সুখদেবের দিকে তাকিয়ে বলল, “কমল রাত্রিকোলাও আপনাকে খেতে  
আমন্ত্রণ জানানোর জন্য জ্বিন করছিল। আপনি আমাদের অক্ষুণ্ণ মনে করে থাকেন না  
তবে, আমি আর কিছু বলিনি। এখন আপনি জিজ্ঞেস না করেই মেয়েটি মুখ নিয়ে  
এসেছে। আমাদের ঘরের দুধ পান করুন যদি আপনার আপত্তি থাকে, তাহলে আমি  
একটি গাভী এনে দেই। আপনি একটি গাছের বড় পাতায় দুধ দুইয়ে পান করে নিন।”

সুখদেব বলল, “আপনার আম গাছের পর আমার ধর্ম আর আমাকে দুধ পান করতে  
নিষেধ করবেন না।”

সরদার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “কোন আম ?”

সুখদেব বলল, “রাত্রিকোলা আপনি যে আম পাঠিয়েছিলেন ?”

সরদারকে হতভম্ব করে রেখে কমল বলল, “বাবা, ভূমি ঘুমিয়ে পড়বার পর আমি  
করেকটি আম এনে নিয়ে গিয়েছিলাম। মনে করেছিলাম, আমাদের অতিথি গাছের ফল  
খেতে হয়ত কোন আপত্তি করবেন না।”

সরদার সুখদেবের দিকে তাকিয়ে বলল, “মহারাজ। দুধটুকু তাহলে পান করে নিন।”

সরদারের ইঙ্গিতে কমল বাটিতে দুধ ঢেলে সুখদেবের হাতে তুলে দিল। স্ফূর্তা ও  
পিপাসায় সুখদেব অবসর হয়ে পড়েছিল। সে নিজের ইচ্ছায় দু’বাটি দুধ পান করার পর  
সরদারের অনুরোধে আরও এক বাটি পান করল। আমের মত দুধও তার কাছে খুব  
সুধাসুই মনে হল। সুখদেব অনুভব করল, ছোটলোকের ছোঁয়া পেলে দুধের স্বাদ ও  
গন্ধের কোন পরিবর্তন হয় নি।

সুখদেবের পর সরদার নিজেও দুধ পান করল। কমল এবার পাত্রটি নিয়ে ঘরে চলে পেল।

সরদার বলল, “আমার আশংকা ছিল, আপনি আমাদের হাতের কোন কিছুই খাবেন না। তাই আগামী কাল আপনাকে নদীর ওপারে রেখে আসব বলে চিন্তা করেছিলাম। আমার তো মনে হয়, এখন আপনি আরও কয়েকটি দিন আমাদের অতিথি হিসেবে থেকে যেতে পারবেন।”

সুখদেব বিনয়ের সুরে বলল, “আপনার এ আমন্ত্রণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি আমন্ত্রণ না করলেও আমি তাড়াতাড়ি ফিরে যাবার ইচ্ছা করতাম না। আমাদের সমাজে বাইরের কোন লোকের প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু ঐ স্বার্থপর সমাজ ত্যাগ করে কেউ যদি আপনাদের সঙ্গে থাকতে চায়, তাহলে আপনারা তো তাকে ফিরে যাবার জন্য বাধ্য করেন না?”

সরদার বলল, “অবশ্যই না। আমরা তাকে মাথায় তুলে রাখব। তিনি এ সমাজে সকলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সমানাধিকার ভোগ করবেন।”

সুখদেব বলল, “আমার জন্য আমার নিজের সমাজের দরজা এখন বন্ধ হয়ে গেছে।”

সরদার সুখদেবকে আশ্বাস দিয়ে বলল, “তাই যদি হয় তবে আমাদের এ জীর্ণ কুটিরের দরজা আপনার জন্য চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হয়ে রইবে।”

ছয় ৫

কয়েকদিন সরদারের বন্ধিত অবস্থান করার পর সুখদেব অনুভব করল, সে যেন বহুকাল থেকেই এই সমাজে বসবাস করে আসছে। এখানে কারো প্রতি কারো ঘৃণা নেই। কেউ কারো চেয়ে কেউ বা বড় নয়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সুখ দুঃখের সমান অংশীদার। এই নীচ জাতের লোকেরা খুবই সরল এবং অতিথি পরায়ণ। এদের মন উদার ও দৃষ্টি স্পষ্ট। আর্থ্য সমাজ থেকে উদারতা বহুকাল আগেই বিদায় নিয়েছে। সেখানে নানা স্থপার ভেদ-বিচার রয়েছে। রয়েছে ছোঁয়াছুঁরির সংকীর্ণতা। তারা মানুষকে মূল্য হিসাবে বুকে টেনে নিতে জানে না। ব্রাহ্মণরা ধর্মের ইজারাদার। তারা জঘন্য পশু হিসেবে অন্য জাতের নমস্যা দেবতা হিসাবে পূজনীয়। নিঃশ্রেণীর মানুষ জানে—সরিষায় ও চরিত্রে শতগুণ উন্নত হলেও সে একজন মুর্থ ও দুর্চরিত্র ব্রাহ্মণের সম্মুখীন লাভ করতে পারে না।

সুখদেবের ইচ্ছা, সমাজে ফিরে গিয়ে সে উচ্চজাতের লোকদের নিকট উদারতার

মতবাদ প্রচার করবে। কিন্তু এ পাহাড়-জঙ্গলে সে যেন কিসের এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতে লাগল। রাত্রিতে সে বিছানায় শুয়ে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ উপলব্ধি করল, কমল তার অন্তরের এক বিরাট অংশ দখল করে নিয়েছে। যে রাতে এ অক্ষুণ্ণ যুবতী তার জন্য কিছু ফল উপহার নিয়ে এসেছিল, সে রাতেই সুখদেব অজান্তেই স্বাক্ষর নিজের অন্তরের কিছু জায়গা ছেড়ে দিয়েছে।

চিন্তা করতেই সুখদেব ভয়ে অথকে উঠল। 'কৃত্রিয় বংশের রক্ত ধারার উপস্থিতির কারণেই হয়ে সে নিজেকে এক নীচজাতের অক্ষুণ্ণ যুবতীর প্রেম ভিক্ষু করল। কৃত্রিম গিয়ে লক্ষ্য আড়ষ্ট হয়ে পড়ল। সে নিজে নিজেই বলে উঠল, "না, না এ হতে পারে না। কমল সুন্দরী, কমল সরলা, অতিশয়পরায়ণ ও উদারমনা। এসবই সত্য। তবু সে নীচ বংশে জন্মেছে। সে আমার কেউ না। কেউ হতে পারে না।"

একদিন সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগে সুখদেব নদীর তীরে একটি পাথরের উপর বসে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তায় নিমগ্ন হল। নদীর শুপারে সুখদেবের রাজত্ব তার আর স্থান হবে না এ কথা সত্য কিন্তু যদি সে কোন দূর দেশে চলে যায়, তাহলে তো সেই সমাজে মিশে যেতে আর কোন বাধা থাকবে না। এ সমাজের সরল ও অনাড়ম্বর জীবন তার ভাল লাগছে বটে, কিন্তু তাই বলে সরদারের ও তার কন্যার দয়ার পাত্র হয়ে কতদিন সে এখানে থাকবে? চিন্তিত মনে সুখদেব উঠে সরদারের বাড়ীর দিকে হাটতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ আগে সূর্য অস্ত গেছে। আধো আধো আধো আধারে ঘাসের উপর কি যেন সে দেখতে পেল। সুখদেব এগিয়ে পেল।

কমল পথের ধারে ঘাস পরিষ্কার করছে। সুখদেব তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি করছ, কমল?"

কমল হাসি মুখে বলল, "আপনি সোদিন যে আমগুলো খেয়েছিলেন তার আঁটিগুলো আমি এখানে পুতে দিয়েছিলাম। দেখুন, এ কয়দিনে তার সব কয়টিরই অংকুর বেরিয়েছে। চারাগুলির পোড়ারশত শাক করে দিচ্ছি।

সুখদেব কিছুক্ষণ আগে অন্য দেশে চলে যাবার কথা ভাবছিল। এখন কমলের কোমল সলজ্জ কণ্ঠস্বর যেন তার প্রাণে এক আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল, "এগুলো কি কোন বিশেষ ধরণের আমের আঁটি?"

কমল মাথা নীচ করে মৃদু হেসে বলল, "না, এগুলি কোন বিশেষ আমের আঁটি নয়। তবে এ গুলো আঁটনার খাওয়া আম থেকে পেয়েছি।"

সুখদেব নয়ে দেখল, অনেকগুলো আমের আঁটি থেকে সত্যি সত্যি অংকুর বের হয়েছে। বলল, "তোমার দেয়া সেই আমগুলো খুবই মিষ্টি ছিল, কমল।"

কমল কান দিকে লাজুক লাজুক চোখ তুলে তাকাল। তার গালে লজ্জার রক্ত আভা ফুটে উঠল। দৃষ্টি নামিয়ে সে বলল, "ভাল জাতের পাকা আম তো এ রকমই মিষ্টি হয়। তবে আপনি খুব ক্ষুধার্ত ছিলেন বলেই বোধকরি বেশী মিষ্টি লেগেছে।"



সুখদেব বলল, “যাহোক, আমগুলো নিঃসন্দেহে খুব মিষ্টি ছিল। ঐ মিষ্টি আমার লোভে হয়ত আমাকে আরও কিছুদিন এখানে থাকতে হবে।”

কমল চমকে উঠল। বলল, “তাই?”

সুখদেব বলল, “কমল! যদি বেশী দিন থাকি, তাহলে তোমরা কি বিক্রি হয়ে পড়বে?”

কমল বিত মুখে বলল, অতিথির জন্য বিরক্ত হওয়া আমাদের স্বভাবেরই বাইরে। আপনি নিশ্চিন্ত মনে থাকুন। আপনার সেবায়ত্তের কোনদিনই অভাব হবে না।

সুখদেব বিস্মিত মুখে বলল, সত্যি বলছ, কমল!

কমল বলল, “শুধু সত্যি নয়, বরং আপনি যদি ঐ কথা জোর চলে যেতে চান, তাহলে বাবা আপনাকে কিছুতেই যেতে দেবেন না। অবশ্য আপনি যদি উপযুক্ত আতিথ্যের অভাবে বিরক্ত হয়ে চলে যেতে চান, তাহলে আনন্দিত কথা। আপনার ইচ্ছার কে বাধা দিতে পারে?”

“কমল! এ বস্তুতে এমন একজন মানুষ রয়েছে যার বিশ্বাস আমাকে মানতে হবে।”

কমল লজ্জিত মুখে প্রশ্ন করল, “কে সে মানুষটি জানতে পারি কি?”

“তুমি তাকে জান না?”

“না তো! যদি জানতে দেন, তাহলে তাকে দিয়ে আমি মিনতি করে বলব, সে যেন আপনাকে চলে যেতে বারণ করে।”

“কমল! তুমি জানো না। শুধু তোমার অনুরোধই আমি উপেক্ষা করে চলে যেতে পারব না। নইলে আর কেউ আমাকে বাধা দিতে অটাকাতে পারবে না।”

কমল আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, “কি?”

“হ্যাঁ, তুমি।”

“আপনি মহারাজার সৈনিক হলে বংশের লোক, আমার মত সাধারণ একটি বালিকার অনুরোধ আপনি রক্ষা করবেন?”

“করব কমল! আমি হলে আমার উচ্চ বংশ এবং পদ মর্যাদা সবই ছেড়ে দিয়েছি।”

“তাহলে আমি হাজার ধনিকলব, আপনি থাকুন, কখনও চলে যাবেন না।”

সুখদেবের গলা কেঁপে উঠল। বলল, “তুমি যদি বল, তাহলে আমি যাব না। কখনও যাব না। আর আমি যাবই তা কোথায়?”

ওদের কথার মধ্যখানে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। দুজনেই ছুটে গিয়ে একটি বড় গাছের শাখার নীচে পরস্পরের খুব নিকটে দাঁড়িয়ে নিজেদের বৃষ্টির ফোঁটা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু দুজনেই নিজেকে বাঁচানোর পরিবর্তে অপরকে বাঁচানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠল। ফলে তাদের মধ্যকার দূরত্ব দূর হয়ে গিয়ে নেহ ও মনের নৈকট্য স্থাপিত হতে গেল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। কারো মুখে কথাটি নেই। বৃষ্টির জোর কমে গেলে অন্ধকারে তারা হাত ধরাধরি করে ঘরের দিকে রওনা হল।

কুটিরের নিকট পৌঁছে কমল বলল, “লীড়ান, আমি আগে যাই। আপনি পরে আসুন।”

পরের দিন সুখদেব সরদারকে বলল, “আমাকে একটি পৃথক ঘর তৈরী করে নেয়ার অনুমতি দিন। আমার জন্য আপনাদের খুবই কষ্ট হচ্ছে।”

সরদার বলল, “আপনার মত অতিথির জন্য আমার ঘর সর্বদাই প্রশস্ত থাকবে। আমি মনে করি, বুড়ো বয়সে আমি একটি সন্তান পেয়েছি।”

সুখদেব অনুমান করল, সব কিছুই যেন কোন এক অদৃশ্য হাতের খেলা। তার নদীতে পাড়ি দেবার জন্য স্থিতি করা, নৌকাচুবি, অশুভদের দ্বারা ঈর্ষার এবং জীবন রক্ষা, সরদার ও তার কন্যা কমলের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাদের অতিরিক্তায়তন ইত্যাদি সবই যেন কার গোপন হাতের ইশারায় একে একে ঘটে যাচ্ছে। সুখদেব নিজেকে সেই অদৃশ্য শক্তির হাতেই ছেড়ে দিল।

রাত্রিকালে সাধারণত সুখদেবের খাটিয়া ঘরের বাইরে পৌঁছত দেওয়া হয়। অবশ্য বৃষ্টিবাদল হলে তাকে ঘরেই এক কামরায় গুতে হয়। সেখানে চিতা বাঘ ও ভাল্লুকের চামড়া দিয়ে তার বিছানা পাতা হয়। দেয়ালে তার তরবারীখানিও লটকানো হয়। তরবারীখানি সে ফেলেই দিয়েছিল। কিন্তু কমল সেটা হুলে নিয়ে এসে ঐখানে ঝুপিয়ে রাখে।

## সাত

ভাদ্র মাসের পর থেকেই অসহায়ায় শীতের প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। এখন সবাই বাইরে শোয়া বন্ধ করে নিয়ে ঘরে শোয়া শুরু করেছে। সরদার রাত্রির খাবার পর সুখদেব ও কমলকে নিজের কামরায় ডেকে নিয়ে নানা বিষয়ে গল্প গুজব করে। অনেক রাত্রেই সুখদেব নিজের বিছানায় এপাশ ওপাশ করে অপর দিকের কামরায় নিদ্রিতা কমলকে ফিঙ্গার চোখে দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সুখদেব নিকটের একটি জলাভূমির চারদিকে হেঁটে বেড়ায়। তারপর খিলে নেমে স্নান করে স্নান থেকে বড় বড় পল্লফুল তুলে নিয়ে ঘরে ফেরে।

একদিন সুখদেব নিজের কামরায় বসে সন্ধ্যা তুলে আনা একটি পল্লফুল নিজের গালে লাগিয়ে সুবাসিত্ব করছে, ঠিক এমনি সময়ে কমল নুনের বাটি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল। কিছুক্ষণ অবাচ বিষয়ে সুখদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, “নিম, এই দুখটুকু খেয়ে নিম।”

সুখদেব বসন্ত খেয়ে কমলের দিকে ফিরে ডাকাল। হাত থেকে তার ফুলটি নীচে পড়ে গেল। কমল দুধের বাটিটি সুখদেবের হাতে ছুঁলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, “আপনি ফুল খুব পছন্দ করেন, তাই না?”

সুখদেব হাসিমুখে বলল, “পছন্দ তো করি। কিন্তু কেন করি তা কি জান?”

কমল হাসি মুখে বলল, “না তো!”

“পছন্দ করি এজন্য যে, এই ফুলটির নাম কমল।”

কমল লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। তার চেহারায় এমন এক অপরিচিত সৌন্দর্য ফুটে উঠল যা সুখদেব আগে আর কখনও দেখেনি।

সুখদেব বলল, “কমল! তুমি এই পত্র ফুলের চেয়েও অনেক বেশী সুন্দর।”

কমল নিজের গাউনের উপর তাকানি রেখে সুখদেবকে চূপ করলে ইশারা করল এবং চোখের ইঙ্গিতে শাসনের ভঙ্গীতে পাশের কামরাটি দেখিয়ে দিল। সুখদেব হত চকিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, “সরদারজী এখনও কামরায় আছেন না?”

কমল ফিস ফিস করে বলল, “হ্যাঁ, বাবা বাইরে যান নি।”

সুখদেব গলার স্বর আরও খাটো করে বলল, “আমি তো সত্যি কথাটিই বলেছি, কমল! কোন অন্যান্য তো করি নি।”

কমল বলল, “আচ্ছা, আচ্ছা চের হয়েছে। এবার দুধটুকু খেয়ে নিন তো।”

সুখদেব দুধের বাটি মুখে লাগাতেই হঠাৎ বাজার বাইর থেকে চীৎকার শোনা গেল।

কমল ভয় পেয়ে বলল, “বাইরে বোধহয় কোন গোলমাল হচ্ছে।”

সুখদেব দুধটুকু এক ছুমুকে শেষ করে বলল, “আমি তো চারদিক থেকেই চীৎকার শুনিছি। মনে হচ্ছে গুঁরা এসে গেছে।

কমল শুকনো মুখে প্রশ্ন করল, “কি?”

“বাহাদুর দেব-সেনাপণ।” বলল সুখদেব তরবারী হাতে নিয়ে বলল, “দাঁড়াও, আমি দেখছি।”

সুখদেব কামরা থেকে বের হতে না হতেই কয়েক জন লোক দৌড়ে এসে বাড়ীতে ঢুকল। তারা উঠানে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলতে লাগল, “সরদারজী কোথায়? গুঁরা এসে গেছে। আমাদের পেরেকজনকে গুঁরা হত্যা করতে শুরু করেছে।”

সুখদেব জিজ্ঞেস করল, “কারা এসেছে?”

সুখদেবের কথায় কর্ণপাত না করে লোকগুলো চীৎকার করতে লাগল, “সর্বনাশ হয়েছে। আমাদের সবাইকে গুঁরা মেরে ফেলবে।”

সুখদেবের হতে বাঞ্চিল, একজন যুবক তার হাত ধরে বলল, “কোথায় যাচ্ছেন? খবরদার বাইরে যাবেন না। গুঁরা সংখ্যায় অনেক। মরণের মুখে এই ভাবে যাওয়া ঠিক নয়।

কামরার চোখ কচলাতে কচলাতে নিজের কামরা থেকে বের হয়ে কী হয়েছে জানতে চাইল। একজন বলল, “রাত্রিবেলা গুঁরা নদী পার হয়ে চলে এসেছে এবং হঠাৎ

অক্রমণ করে আশেপাশের বস্তিগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমাদের বস্তিতেও সৈনিকরা প্রবেশ করেছে। যাকে সামনে পাচ্ছে, মেয়ে ফেলছে। বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এখন আর দাঁড়াবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি পালানো দরকার।”

সরদার সুখদেবের মুখের দিকে তাকাল। সুখদেব বলল, “আপনারা এখানে থাকুন। আমিদেখছি।”

ততক্ষণে কিছুলোক দৌড়ে এসে বলল, “সৈনিকেরা এদিকেই আসছে। সুখদেব ছুটে বের হয়ে গেল।

## আট

সুখদেব সরদারের বাড়ী থেকে বের হয়ে দেখেছে গুল দূরে আগুন জ্বলছে আর ভীত-সন্ত্রস্ত লোকজন এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছে। বেশীর ভাগ লোকই পালাচ্ছে পাহাড়ের দিকে। অল্প কয়েকজন লোক সরদারের নিকট পরামর্শ চাইতে এসেছে। শুনিকে একজন খোড়া সওয়ার অফিসারের নেতৃত্বে একদল পদাতিক সৈন্য নিরীহ লোকদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। সুখদেব সেদিকে ছুটে গেল। হঠাৎ সৈনিকেরা তাদের এই পুরাতন সেনাপতিকে দেখেছে-শেয়ে বিষয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। তাদের যুবক দলপতি “সেনাপতিজী,” “সেনাপতিজী” বলে চীৎকার দিয়ে খোড়া থেকে নেমে সুখদেবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। এ যুবক রামদাস। সে বলল, “ভগবানকে ধন্যবাদ। আপনি তাহলে বেঁচে রয়েছেন। আপনি এতদিন কোথায় কিভাবে রইলেন?”

সুখদেব বলল, “এখন আশ্রয় করার সময় নেই। সৈনিকদের হত্যা ও লুটতরাজ করতে নিষেধ কর।”

“কিন্তু--”

“কোন কিন্তু নেই। আমি তোমাকে হুকুম দিচ্ছি।”

“আপনার আদেশ শিরোধার্য, তবে এখন গঙ্গারাম আমাদের সেনাপতি। তিনি হুকুম দিয়েছেন, একজনকেও জীবিত পালিয়ে যেতে দেয়া চলবে না।”

সুখদেব উচ্চস্বরে বলল, “আমি তোমাকে আদেশ করছি, রামদাস। এই কাজ বন্ধ কর।”

সাবেক সেনাপতির রাগান্বিত চোখমুখ দেখে রামদাসের মনে পুরাতন আনুগত্যের মনোভঙ্গি ফিরে এলো। সে চোখের নিমিষে খোড়া ছুটিয়ে বস্তির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুখদেব সৈনিকদেরও আদেশ করল, তারা যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে হত্যা ও লুটতরাজ বন্ধ করার নির্দেশ পৌঁছে দেয়। সৈনিকগণ পুরাতন সেনাপতির আদেশ সকলের নিকট পৌঁছে দিতে শুরু করল।

একটি টিলার উপর থেকে নিজের সাদা ঘোড়ার পিঠে বসে গঙ্গারাম তার স্বীকৃতির পবিত্রতম দায়িত্ব পালনের দৃশ্য দেখছিল। আট দশজন সশস্ত্র গ্রহরী দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বীর সেনাপতি নিরস্ত্র ও অসহায় বস্তিবাসীদের নির্ধম হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করে দেবতাদের আশীর্বাদ লাভ করছিল। রামদাসকে ঘোড়া চড়ে ফিরে আসতে দেখে সেনাপতি আশ্চর্য হল। রামদাস নিকটে এসে বলল, “মহারাজ সেনাপতিস্বীকৃতি পাওয়া গেছে। তিনি বস্তিবাসীদের হত্যা করতে এবং তাদের বাড়ীঘরে আগুন লাগাতে নিষেধ করে দিয়েছেন।”

গঙ্গারাম ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “কোন সেনাপতি? সেনাপতি তো আমিই! কি ব্যাপার, রামদাস? তোমার কি মতিভ্রম ঘটেছে?”

“আমার মতিভ্রম ঘটেনি মহারাজ! এক্ষুণি আমি সেনাপতি স্বীকৃতি বকে দেখে এসেছি। তিনি আমাকে নরহত্যা এবং অগ্নি সংযোগ বন্ধ করার জন্য আদেশ করেছেন।”

“তুমি বলছ যে, সুখদেব এখানে আছে এবং তোমাদের তার হুকুম মেনে কাজ করতে বলছে। অর্থাৎ আমার এবং মহারাজার আদেশ অমান্য করতে সে নির্দেশ দিচ্ছে! তাই নয় কি?”

“মহারাজ! তিনি একথা বলেননি। তিনি বলেছেন, এসব লোক নিরপরাধ। এদের হত্যা করা অন্যায়।”

“আচ্ছা, শত শত বছর ধরে এ বন্দ্যুপুত্রগুলো আমাদের মহারাজার অবাধ্য হয়ে এখানে স্বাধীন জীবন যাপন করছে। আর সুখদেব কিনা বলে ওরা নিরপরাধ! কোথায় সে সুখদেব?”

রামদাস বস্তির অপর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, “এখানে মহারাজ!”

গঙ্গারাম ও তার সঙ্গীগণ রামদাসের সঙ্গে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে সুখদেবের সন্ধানে এগিয়ে চলল।

এখানে সুখদেব রয়েছে শুধু অনেক সৈনিক ছুটে এসে তার নিকটে জড়ো হয়েছিল। পাহাড়ী সরদার সাধন এবং তার লোকেরা মনে করল, হয়ত এ যাত্রা তারা রক্ষা পেয়ে গেল। তাই তারাও ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একটু দূরে দাঁড়াল। সুখদেব সাধনের বিমর্ষ চেহারা এবং কক্ষের অশ্রু-সজল চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা অবনত করল।

একজন যুবক একটি আহত শিশুকে কোলে নিয়ে সুখদেবের কাছে হাজির হল। তারপর শিশুটিকে তার পায়ের কাছে রেখে দিল। নিশাপ কুলের মত শিশুটির বুক থেকে তখন হৃৎকণের ধারা বয়ে যাচ্ছে। শিশুটির দু’চোখে অসহায় কাতর দৃষ্টি। তার সারা দেহে তখন মৃত্যুর চিহ্ন পরিষ্কৃত হয়ে উঠেছে।

সুখদেবের অন্তর বেদনায় হাহাকার করে উঠল। সে শিশুটিকে পরম শ্রদ্ধে কোলে

উঠিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে শিশুটির মুখ থেকে এক ঝলক রক্ত বের হয়ে এলো এবং নিশ্বাস শিশুটি চিরদিনের মত চোখ বন্ধ করল। শোকে অভিভূত সুখদেব শিশুটিকে মাটিতে শুইয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি রমনী চীৎকার করে মৃত দেহটি বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর কাটা কবুতরের মত তড়পাতে লাগল।

দেবতার সৈনিকেরা অবাক হয়ে এই দৃশ্য দেখছিল। তাদের প্রাক্তন সেনাপতি সুখদেব একটি অক্ষুণ্ণ শিশুর মৃত্যুতে কেন এত শোকার্ত হয়ে পড়ল, তারা তার কারণ খুঁজে পেল না। সৈনিকেরা মনে করল, সুখদেব আসলে পাগল হয়ে গেছে।

ততক্ষণে রামদাসের সঙ্গে নতুন সেনাপতি গঙ্গারাম ও তার সঙ্গীরা সেখানে পৌঁছে গেল। গঙ্গারাম চেঁচিয়ে বলতে শুরু করল, “সুখদেব! তুমি এখানে আর আমার নিকটে এতগুলো অক্ষুণ্ণ নরনারী কেন সাহসে দাঁড়িয়ে রয়েছে? তোমার কি হয়েছে? মোটেই লজ্জ না কেন?”

একথাগুলো শুনেই সাধন সরদার, কমল ও তাদের মুহূর্তেই সাধী ছাড়া বাকী সবাই এনিক-সেনিক দৌড়ে পালিয়ে গেল।

গঙ্গারাম রাগে কীপতে লাগল। সে সুখদেবের সম্মুখে এসে বলল, “তুমি জীবিত রয়েছ দেখে আমি খুবই খুশী হয়েছি। একজন সৈনিক হিসাবে প্রাক্তন সেনাপতিকে সম্মান করাও আমার কর্তব্য। কিন্তু আমি সেনাপতি তুমি আমার সৈন্যদের রাজা ও সমাজের বিরুদ্ধাচরণে উৎসাহী নিছক। তুমি কি তো কতকটা পালন করতেই পারনি। এখন ব্যক্তিগত দৃশ্যময়ীর কারণে আমাকেও সফলতা অর্জন করতে না দেয়ার উদ্দেশ্যে এ অশুভ তৎপরতার লিঙ্গ হয়েছে।”

সুখদেব নীরবে হতভাগিনী মায়ের কোলে থেকে মৃত শিশুর লাশটি তুলে নিয়ে গঙ্গারামের সামনে রেখে বলল, “এই হল তোমার সফলতার সব চাইতে বড় প্রমাণ। এ নিশ্বাস শিশুর রক্ত নিয়ে তোমার সমাজ ও রাজার বীরত্বের ইতিহাস লিখে রাখো, গঙ্গারাম! তোমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণেরেরা এ কৃতিত্বের ইতিহাস পড়ে বুক ফুলিয়ে গর্ব করতেপারবে।”

গঙ্গারাম চেঁচিয়ে বলল, “আমার সমাজ! আমার রাজা! তোমার কিছু নয়? এ অপবিত্র মাংসপিণ্ডটি তুমি হাতে ধরে নিজের ধর্ম থেকে ত্রুটি হয়ে গেলে না?”

“এ নিশ্বাস শিশুর দেহ তোমার দেহের চাইতেও অনেক বেশী পবিত্র, গঙ্গারাম।”

গঙ্গারাম রাগে দাঁত-কিড়মিড় করে বলল, “সুখদেব! তুমি চম্বল হয়ে গেছ। একটি কুকুরীর বাচ্চাকে তুমি হাতে তুলে নিয়ে বলছ কিনা ওটা আমার দেহের চেয়েও বেশী পবিত্র। হিঃ হিঃ তোমার এতই অধঃপতন হয়েছে সুখদেব? ওরা তোমায় যাদু করেছে নাকি?”

সুখদেব তাড়াতাড়ি শিশুর লাশটি মায়ের কোলে তুলে দিয়ে তরবারী হাতে গঙ্গারামের বিরুদ্ধে রুখেদাড়া।

গঙ্গারাম ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নীচে নামল। তারপর তরবারী খাপ মুক্ত করে সেও

দাঁড়িয়ে গেল। সিপাইদের মধ্যেও প্রবল চাক্ষুণ্য দেখা দিল। তা দেখে গঙ্গারাম বলল, "সাবধান! আমার প্রতি সুখদেবের ব্যক্তিগত শত্রুতা রয়েছে। তোমরা কেউ এর তিতর না কর পলাবেনা।"

দুই সেনাপতি ভরবারীর ঘায়ে পরস্পরকে ঘায়েল করার চেষ্টায় উত্তেজিত হয়ে উঠল। সুখদেবের প্রচণ্ড আক্রমণে গঙ্গারাম পেছনের দিকে হটেতে বাধ্য হল। হঠাৎ পা ফস্কে মাটিতে চিং হয়ে পড়ে গেল। পড়েই আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু সুখদেবের ভরবারীর অগ্রভাগটি তার বুক ছুঁয়ে নিশ্চল হয়ে রইল। দুমুহুর পর সুখদেব ভরবারী উঠিয়ে নিয়ে বলল, "ওঠো সেনাপতিজী! তোমার বেকায়দা খুবস্থায় আমি তোমাকে হত্যা করব না।"

গঙ্গারাম উঠে দাঁড়াবার পর সুখদেব বলল, "এবার সামলে দিওছ তো। তাহলে এগিয়ে এসো।"

পুনরায় দুজনের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল। এক উল্লেখ্যকর মুহুর্তে যখন গঙ্গারাম সুখদেবকে আঘাত করতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে সাহাড়া সরদার সাধন চোঁচিয়ে বলল, "ধামুন! আপনারা আমাদের মত নগণ্য মানুষের জন্য পরস্পরকে হত্যা করবেন না। আমরা—" তার মুখের কথা শেষ হ'বার আগেই সাধন এসে যুদ্ধরত উভয় সেনাপতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল এবং ঠিক ঐ সময়েই সুখদেবের উদ্দেশ্যে গঙ্গারাম ভরবারীর যে প্রচণ্ড আঘাতটি করেছিল, তা সরদারের মাথাটিকে বিখণ্ডিত করে ফেলল। কমল "বাবা" বলে চীৎকার করে শূন্যে গড়ল। সুখদেবও ভরবারী ছেড়ে দিয়ে মরণোন্মুখ বৃদ্ধের হাত ধরে ছুমো থেকে খেঁতে বলল, "আমার জীবন রক্ষাকারী বাবাজী। তুমি কেন আমাদের মাঝখানে এসে মৃত্যুতে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিলে?"

একটি শূন্য শব্দের হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ্য করে সুখদেবের ব্যবহার সৈনিকদের নিকট খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হল। তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতো লাগল। এবার নীচ জাতের এ সরদারকে "বাবা" সম্বোধন করায় তারা মনে করল সুখদেবের সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

গঙ্গারাম বলল, "তোমার প্রতি দেবতাদের অভিশংসাত বর্ষিত হোক। তুমি এক শূন্যকে "বাবাজী" সম্বোধন করে হিন্দু জাতির চরম অবমাননা করছ।" সে সিপাইদের হুকুম করল। সুখদেবকে গ্রেফতার কর। কমল এ সময় হঠাৎ পিতার লাশ ছেড়ে দিয়ে সুখদেবের ছুঁড়ে দেয়া ভরবারীখানা উঠিয়ে নিল এবং বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গিয়ে গঙ্গারামকে আঘাত করল। একজন সৈনিক তার হাত ধরে ফেলেছিল। তবু ঐ আঘাতে গঙ্গারামের পা স্নান হ'ল। সৈনিকগণ সুখদেব ও কমলকে ভালভাবে মজবুত রশি দিয়ে বেঁধে ফেলল। অচিরেই বিষয়, গ্রেফতারীর সময় সুখদেব একটুও নড়াচড়া করল না। তার মুখ থেকে কোন প্রতিবাদও বের হয়ে এলো না।

তিনখানি নৌকা সুরমা নদীর ওপর নিয়ে ভেসে যাচ্ছে। একটি নৌকায় গঙ্গারাম, রামদাস এবং কতিপয় সৈনিক। দ্বিতীয় নৌকায় সুখদেব, কমল ও কয়েকজন প্রহরী এবং তৃতীয় নৌকায় কয়েকটি ঘোড়া বাঁধা রয়েছে।

দেব-প্রহরীদের সরদারকে হত্যা করার পর গঙ্গারাম বুঝতে পেরেছে যে, শূন্দেরা আর আক্রমণ করতে সাহসী হবে না। তবু সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসাবে সে তার ভাই জয়রামের অধীনে সৈন্যদলকে সেখানে রেখে নিজে কতিপয় সৈন্যসহ সুখদেবকে নিয়ে মহারাজার দরবারের রওনা হল। লুটতরাজের এ সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ে দিয়ে যে সব সৈনিক গঙ্গারামের সঙ্গে ফিরে যাচ্ছে তারা মোটেই বুশী নয়। গঙ্গারাম তার এ বিজয়ের খবর নিজের মুখেই মহারাজার নিকট পৌঁছ বার জন্য ভীষণ ব্যস্ত। তাছাড়া, সুখদেবের লালনা দেখার আগ্রহও তার কম নয়। কারণ সুখদেব এক সময় রাজ দরবারে বিশেষ সম্মান লাভ করতো। তার উপস্থিতিতে গঙ্গারাম একজন সাধারণ সামরিক অফিসার ছিল মাত্র।

সুখদেব কমলকে বলল, "আমার জন্যেই তোমাদের এ দুর্দশা হল, কমল!"

কমল বলল, "আমাকে গ্রেফতার করার সময় আপনি আমাকে ছেড়ে দিতে বলেছিলেন। আপনি কি মনে করেন, এই অক্ষুণ্ণ বাসিকাটি বিপদের সময় আপনাকে ছেড়ে চলে যাওয়া নিজের জন্য নিরাপদ মনে করে?"

সুখদেব ত্রান হেসে বলল, "না কমল! তুমি তো আমার নিকট অক্ষুণ্ণ নও। কিন্তু তোমাকে আমার সঙ্গে বিপদের মধ্যে টেনে আনা আমার জন্যে বাস্তবিকই বেদনাদায়ক।"

কমল কাঁদা ভেজা কণ্ঠে বলল, আপনি তো স্বচক্ষেই দেখেছেন, বাবার আমি কেমন আদরের কন্যা। বাবাকে ধরা আমার চোখের ওপর নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল। পৃথিবীতে এখন আমার কে আছে যে আমাকে আশ্রয় দেবে? এখন যদি আপনার পদতলে আমি আশ্রয় পাই, তবে আপনার সাথে মরণ হলো আমার কোন দুঃখ থাকবে না।

নৌকা তীরে উঠল। গঙ্গারাম বলল, "সুখদেব! আমি তোমাকে সাধারণ কয়েদীর মত দরবারে নিয়ে যেতে চাই না। যদি তুমি পালাবে না বলে অস্বীকার কর, তাহলে আমি তোমার হাতের বাঁধন খুলে দেব এবং তোমাকে ঘোড়ায় সওয়ার করিয়ে নিয়ে যাব।"

সুখদেব বলল, "আমি কথা দিতে পারি, তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, এই মেয়েটিরও হাতের বাঁধন তোমাকে খুলে দিতে হবে এবং তার জন্যও ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে



হবে।”

গঙ্গারাম প্রথম শর্ত মঞ্জুর করে নিয়ে উভয়ের হাতের বীধন খুলে দিল। কিন্তু এ “নীচ” জাতের বালিকার জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে অধীকার করার সুখসেবক কমলের সঙ্গে হেঁটেই চলল।

ঠিক একদিন পর সুখসেবকে সশস্ত্র প্রহরাধীন মহারাজার দরবারে বিচারের জন্য হাজির করা হল। সে অত্যন্ত ধীর ও সুমিষ্ট ভাবায় নিজের সাফাই পেশ করতে গিয়ে বলল, “মানুষের রচিত শ্রেণী-বিদ্বেষ, জাতিভেদ প্রথা নেহায়েতই অযৌক্তিক। তথাকথিত অক্ষুংগণ কোন অপরাধ করেনি। তারা বাধীনভাবে নিজেদের এলাকায় শুধুমাত্র বসবাস করেছে। কারো কোন অনিষ্ট চিন্তাই তারা করে না। তাদের বাড়ীঘর ছালানো এবং পাইকারী হারে বিনা-অপরাধে হত্যা করার নাম-ধর্ম হ’তে পারে না।” সুখসেব গঙ্গারামের অভিযোগগুলোর কোনই জবাব দেয়ার দরকার মনে করল না।

সুখসেবের যুক্তিপূর্ণ কথায় মহারাজার মন সায় দিলেও পুরোহিতের ভয়ে তিনি তার স্বপক্ষে কোন কথাই বলতে পারলেন না।

পুরোহিত রাজার চেহারা দেখে বুঝতে পারল যে, তিনি সুখসেবের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাই সে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, “মহারাজ! সুখসেব জঘন্য অপরাধে অপরাধী। তাকে সেব-দ্রোহী অক্ষুং সমাজকে দমন করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। সে তাদের দমন করার পরিবর্তে ঐ সমাজেরই এক মূল্য বালিকার সঙ্গে প্রেম করে ধর্মের অশেষ ক্ষতি করেছে। তাকে লম্বু শাস্তি দিয়ে সমাজের নিয়ম-শৃংখলা ভেঙ্গে যাবে। হাজার হাজার যুবক উক্ষুংকল হয়ে যাবে। তাই প্রার্থনা, তাকে বিনা বিধায় মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক।”

মহারাজ পুরোহিতের চোখমুখ দিয়ে বুঝতে পারলেন, সুখসেবের প্রতি সামান্য মাত্র দয়ার মনোভাব দেখালেই পুরোহিত ঠাকুর নারাজ হয়ে পড়বে। তিনি বললেন, এ বিষয়ে পুরোহিত ঠাকুরই চূড়ান্ত কার্যসাধা করবেন।

পুরোহিত ঠাকুরের ঠোঁটে নিজের হাসি ফুটে উঠল। সে দাঁড়িয়ে বলল, “মহারাজ! ধর্মের পবিত্রতা নষ্ট করা মহাপাপ। সুখসেব মহাপাপী। তাকে কালীমন্দিরে বলিদান করা হোক। আর এ অক্ষুং বালিকাকে হাত পা বেঁধে সুখসেবের জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করা হোক।”

পুরোহিতের রায় মানে সুখসেব নিজের জন্য কোন চিন্তা করল না। কিন্তু কমলের জন্য পুরোহিতের নির্ধারিত দণ্ডদেশ শুনে তার সারা গা শিউরে উঠল। সে এগিয়ে গিয়ে সিংহাসনের সামনে মাথা নুইয়ে আবেদন করল, “মহারাজ! আমাকে যদি আপনি কালীমন্দিরে বলিদান করতে চান, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। কিন্তু এই সরলা বালিকাটি সম্পূর্ণ নির্দোষ। যদি আমার পূর্বপুরুষেরা আপনার বংশের নিঃস্বার্থ সেবা করে থাকে, তাহলে আমি আপনার নিকট এটুকু দয়া শিক্ষা চাই। এই বালিকাকে তার নিজের লোকদের কাছে ফিরে যেতে দিন।

সুখদেবের কাতর আবেদনে মহারাজের হৃদয় দয়ালু হয়ে উঠল। কিন্তু পুরোহিতের হিংস্র চোখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই তিনি সাহস হারিয়ে ফেললেন। দু'মুহূর্ত পর নিজের আসন থেকে উঠে তিনি পাশের একটি কামরায় প্রবেশ করলেন।

পুরোহিত ঠাকুর সুখদেবকে লক্ষ্য করে বলল, “এই অক্ষুৎ বালিকাকে ছুঁলে যত পবিত্রই মনে কর না কেন, সমাজের আইনে সে নীচ। উচ্চ বংশের দেব-সেনাপতিকে প্রেমের জ্বালে বন্দী করে ত্রুটি করার অপরাধে সে অপরাধিনী। মায়াজাল বিস্তারকারিণী এই ত্রুটি নারীকে অবশ্যই তোমার চিন্তাতেই ফুলতে হবে।

## দশ

অন্ধকার কারাগারের একটি কোঠায় সুখদেব ও অপর কোঠায় কমলকে বন্দী করে রাখা হল। রাত্রিশেষে তাদের বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবে—সেনাকেরা। বাইরে সশস্ত্র প্রহরীর জুতার খট্ খট্ শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনানো যাচ্ছে না। মনে মনে স্রষ্টাকে অরণ্য করে তীরই সমীপে সুখদেব সাহায্যের আবেদন পেশ করছিল। হঠাৎ বাইরে কিসের একটা গোলমাল শোনা গেল। চীৎকার এবং গৈরী থেকে বুঝা যায় যে, দু'দল সৈন্যের মধ্যে লড়াই হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ কারাগারের দরজা খুলে গেল এবং একদল মুখোশধারী সৈনিক ছড়মুড় করে কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের দলপতি এগিয়ে এসে বলল, “সেনাপতিনী! জাড়াভাঙি বের হয়ে আসুন। আমরা প্রহরীদের হত্যা করেছি। একজন মাত্র পালিয়ে গেছে। স্বপ্নে সে আরও সৈন্য সঙ্গে করে নিয়ে ফিরে আসতে পারে। আপনার ঘোড়া তৈরী। কিছুক্ষণ না করে আপনি এখুনি পালিয়ে যান!”

সুখদেব গলার স্বর শুনে অসম্বুদ্ধককে চিন্তে পেরে বলল, “রামদাস! প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাব আমি?”

রামদাস বলল, “কেন যাবেন না? এখানে এ অত্যাচারী রাজসূদের হাতে প্রাণ দেয়ার কি কোন অর্থ আছে? বা বলছি করুন। মোটেই দেবী করবেন না। শীগগীর বের হয়ে আসুন।”

সুখদেব বলল, “রামদাস! সরলপ্রাণা গ্রাম্য বালিকা কমলকে এদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি কিভাবে পালিয়ে যেতে পারি?”

রামদাস নিরন্তর হয়ে গেল। এক মুহূর্ত কী চিন্তা করে সে এক দৌড়ে উধাও হয়ে গেল। তরিশত পাশের কামরার দালা খুলে কমলকেও মুক্ত করে দিয়ে দুজনকেই হাত ধরে ছিন্তে ঘরের বাইরে নিয়ে এলো। সামনে একটি আম পাছের নীচে একজন সিপাই

ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সুখদেব ও কমলকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিয়ে রামদাস বলল, “সূর্য উদয় হ’বার আগেই আপনারা রাক্ষের সীমানা ছেড়ে চলে যাবেন। এক্ষুণি রওনা হয়ে যান। আর আমার এ তরবারী খানা সঙ্গে রাখুন। পথে বিপদ আপনে এটি কাজে আসবে। বোন কমলকে তীরধনুক দিয়ে নিলাম। আস্থা আসুন। নমস্কার।”

যুবক রামদাসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কোন ভাষা খুঁজে পেল না। সুখদেব শুধু বলল, “বিদায়, রামদাস। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।”

রাতভর ঘোড়া ছুটে চলল উর্ধ্বাঙ্গে। সূর্যোদয়ের আগে তারা রাক্ষের শেষ প্রান্তে একটি ঘন জংগলে পৌঁছে গেল। সুখদেব বিশ্রাম করার জন্য রাস্তা গুলুড়ে দিয়ে জংগলের ভিতর একটি নিরাপদ জায়গায় অবতরণ করে ঘোড়াটিকে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল।

ত্রিপ্রহরের কাছাকাছি সময় জংগলের মধ্যস্থিত সড়কে ঘোড়ার খুঁজের শব্দ শুনতে পেয়ে সুখদেব বুঝতে পারল, সে- সৈনিকেরা তাদের খুঁজতে বের হয়েছে। কমল ভীত হয়ে পড়ল। সুখদেব আশ্বাস দিয়ে বলল, “ভয় করোনা কমল। এরা আমাদের খুঁজতে বের করতে পারবেনা।”

সেনাপতি গঙ্গারাম তার সঙ্গীদের জোরে জোরে বলতে লাগল, এ জংগলের মধ্যে তর তর করে ওদের খুঁজতে হবে। কিছুতেই এ সৈন্যবাহিনীর পালাতে দেয়া যাবে না।”

একজন সৈনিক বলল, “মহারাজ! আমরা মাত্র কুড়িজন লোক। সুখদেবের সঙ্গে কত লোক রয়েছে তা আমাদের জানা নেই। সৈন্যবাহিনীর হত্যা করে তাকে কারাগার থেকে যারা উদ্ধার করে নিয়ে গেছে, তাদের সংখ্যা নেহায়েৎ কম হতে পারে না। তাই আমাদের সাবধান থাকার দরকার।”

গঙ্গারাম ধমক দিয়ে বলল, “কাপুরুষের মত কথা বলো না। পলায়নকারী কখনও লড়াই করার ক্ষমতা রাখে না।”

সুখদেব গঙ্গারামের স্বর শুনতে পেল। সে কোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে তার কাছে পৌঁছে গেল এবং গঙ্গারামের কথা শেষ হতে না হতেই একটি তীর ছুঁড়ে দিল। গঙ্গারাম বিকট চীৎকার করে মাটিতে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সুখদেবের ধনুক থেকে শন্ শন্ করে আরও কয়েকটি তীর আশে পাশে এসে পড়তে লাগল। ভীত সন্ত্রস্ত সৈনিকেরা আহত গঙ্গারামকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নিয়ে যুদ্ধের মধ্যে উৎখাত হয়ে গেল।

সুখদেব কিছুক্ষণের পর থাকার পর যখন বুঝতে পারল যে, দুষমনরা পালিয়েছে, তখন কমলের দিকে ফিরে গিয়ে বলল, “কমল ওঠো, চল, আমরা আবার যাত্রা শুরু করি।”

দুদিন যাবৎ বন-জংগল আর পাহাড়ী পথে চলার পর সুখদেব ও কমল খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ঘোড়াটিও আর চলতে পারছে না। তাদের কিছু খাবার এবং কিছুকণের জন্য নিরাপদ বিশ্রামের জায়গা প্রয়োজন। কিন্তু এ জনমানবহীন জংগলে তো লোকালয়ের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। এক সময় কমল উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

বলল, “কোথায় যেন বাঁশীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না?”

সুখদেবও কান খাড়া করে শুনল এবং বলল, “হ্যাঁ বাঁশীই তো মনে হয়। চল, খোঁজ নিয়ে দেখি।”

কিছুদূর অগ্রসর হবার পর দেখা গেল একজন মেঘের রশ্মি পাছের ডালে বসে আপন মনে বাঁশী বাজিয়ে যাচ্ছে। আপশুকদের দেখে বংশাবলক অবাক হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলো। সুখদেব বলল, “ভাই! তুমি আমাদের কিছু খাবার দিতে পারো? দুদিন থেকে আমরা কিছুই খেতে পাইনি।”

রাখাল বালকটি ছুটে গিয়ে কয়েকটি মেঘ ধরে নিয়ে এলো। তারপর তাদেরকে দাঁড় করিয়ে এক এক করে দুধ দুইতে শুরু করল। বাটি পূর্ণ হলে সে সুখদেবের দিকে দুধের বাটিটি এগিয়ে দিল। সুখদেব কমলের দিকে বাটিটি এগিয়ে দিল।

কমল বলল, “না, আপনি আগে পান করুন।”

সুখদেব পান করার পর রাখাল একবাটি দুধ দুইয়ে কমলের সামনে রাখল। পালক্রমে কয়েক বাটি দুধ পান করার পর তারা পরিতৃপ্ত হয়ে একটি পাছের নীচে ঘাস পাতার নরম আস্তরনের উপর শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়েই ঘোড়াটির দিকে সুখদেব জোরে একটি পাথর ছুড়ে দিল। ঘোড়াটি ছুটে অন্য দিকে চলে গেল।

রাখাল বলল, “একি করছেন? ঘোড়াটি তো চলে যাবে।”

সুখদেব বলল, “ওটাকে কে মুক্ত করেই দিলাম। ঘোড়তে আর আমার প্রয়োজন নেই।

রাখাল বলল, “মহানারাজ আমার নাম পীচু। মেঘ চরানো আর চাষাবাদ করাই আমার পেশা। আপনার পরিচয় জানতে পারলে খুশী হতাম।

সুখদেব সংক্ষেপে পীচুর নিকট সমস্ত ব্যস্ততা বলল। সকল কথা শুনে পীচু বলল, “আপনারা এখন অনেক দূরে চলে এসেছেন। আর ভয়ের কোন কারণ নেই। আমাদের সরদার খুবই ভালো লোক। তাঁর নিকটে গেলে তিনি নিশ্চয়ই আপনাদের অশ্রয় দেবেন।

বিকাশে পীচুর সঙ্গে সুখদেব আর কমলকে পাহাড়ের উপত্যকায় একটি ছোট্ট বস্তিতে প্রবেশ করতে দেখে মহানারাজ লোকজন সব ছুটাছুটি করে তাদের দেখতে এলো। পীচু হালি কুটিরের সামনে গিয়ে দু’টি দড়ির খাটিনা বের করে অতিথিদের বসতে দিল। কিছুকণের মধ্যেই রটে গেল যে, এক বড় সরদারের কন্যা এবং তার ক্ষত্রিয় স্বামী

দেশ ত্যাগ করে চলে এসেছে। স্বামীটি ক্ষত্রিয় বংশজাত এবং এক সময় এক রাজার সেনাপতি ছিলেন। ছোট জাতের সরদার কন্যাকে বিয়ে করার অপরাধেই তার এ বিপত্তি ঘটেছে।

গ্রামের বৃদ্ধ মতি সরদারও তাদের দেখতে এলো। বৃদ্ধ লোকটা সুখদেবের পায়ের ধূলা নিতে চাইলে সুখদেব তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "না, না, ঐ কাজটি করবেন না সরদারজী। আপনি বয়সে বড়। আমার গুরুজন ব্যক্তি। আমাকে অপরাধী করবেন না।"

কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর সরদার বলল, "পরীবাদের ঘর-দরজা সবই আপনাদের। যতদিন ইচ্ছা, আপনারা এখানে থাকুন। আপনাদের খেঁচা করতে পারাই আমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়।"

পাঁচুকে ডেকে সরদার বলল, "পাঁচু! তাঁদের নিয়ে আমার বাড়ী চলে। সেখানেই তারা খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করবেন।"

পাঁচু বলল, "খাবার তো তৈরী হয়ে গেছে, সরদার?"

"এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করে খাবার তৈরী করলে?"

"সরদার! আপনার ঘরে থেকেই ভাত আর মাংস গুলেছে। ললিত দুধ দিয়ে গেল। কাঞ্চল দিয়ে গেল মর্ন্তমান কলা। আরও অনেকের ঘর থেকে নানা রকমের তরকারী এসেছে। আমি তো অনেকের খাবার কিরিয়েও দিয়েছি।"

"আচ্ছা, তাহলে খাবার শেষ হলে অতিথিদের আমার বাড়ীতে পৌঁছে দিও।"

পাঁচু বলল, "না সরদার! আজ তাঁরা আমার এখানেই থাকবেন। কাল তাঁদের আমি আপনার বাড়ীতে পৌঁছে দেব।"

"আচ্ছা, তাই করো।" বলে সরদার সুখদেবকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল।

## বার

সুখদেব ও কমল কয়েকদিন বৃদ্ধ মতি সরদারের অতিথি হিসাবে রইল। ইতোমধ্যে সরদারের আদেশে তাদের জন্য পৃথক ঘর তৈরী হল এবং সুখদেব নতুন বাড়ীতে উঠে গেল। পাঁচু সুখদেবের বাড়ীতেই একটি ছোট্ট কুটির তৈরী করে বসবাস করতে লাগল। সুখদেব গ্রামের সকল লোকের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করে। তাদের চাষাবাদ ও পশুপালনের কাজে অংশ নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রামের লোকেরা বাধা দেয়। বলে, "না, না, আপনি একাজ করবেন না। আমাদের ভাগ্যগুণে আমরা আপনার মত দেবতা পুরুষ ও কমল বোনের মত দেবীকে পেয়েছি। আমরা যত দিন রয়েছে, আপনাকে কোন

কাজ করতে হবে না।”

সুখদেবের জন্য সকলেই চাউল, ভরী-ভরকারী, দুধ তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে যায়। সুখদেব তাদের সঙ্গে মাঠে এবং বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। তাদের কাজ-কর্ম দেখাশুনা করে। তাদের সাথে গল্প গুজব করে। সবাই তার মধুর আলাপে মুগ্ধ। সবার স্নিহ্নয়েই তার জন্য তক্তি-ভালবাসা জন্মে গেছে। বুড়ো মতি সরদার নিঃসন্তান। সে সুখদেবের সাথে নানা বিষয়ে পরামর্শ করে। মতি ঐ এলাকার প্রধান সরদার। প্রতি গ্রামেই একজন করে সরদার রয়েছে। তাদের সকলের ওপর প্রধান হচ্ছে মতি সরদার। নিজেদের বিচার-আচার প্রভৃতি জরুরী বিষয়ে যেসব বৈঠক হয়, তখন মতি সরদার সুখদেবকেও সঙ্গে নিয়ে যায় এবং কোন কোন বিষয়ে সুখদেবকেই ফায়সালা করার জন্য অনুরোধ জানায়। সুখদেব কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করে মনোনিবেশিতভাবে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে তার মতামত ব্যক্ত করে। সকলে খুশী হয়ে তার সত্যমতের স্বপক্ষেই সিদ্ধান্ত নেয়।

পার্বতী গ্রামে রামু সরদার নামে জনৈক ব্যক্তি খুবই প্রত্যাশালী। এলাকার জনগণ মতি সরদারের পরেই রামুকে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে মতি প্রভা করে। সে এক সময় একটি নৈতিক অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল এবং সরদারপণের বৈঠকে তার দশ বছরের নির্বাসন হয়।

মতি সরদার অত্যন্ত বুড়ো হয়ে পড়েছেন। এখন তার স্বাস্থ্যও আজকাল ভাল যাচ্ছে না। তাই প্রথা মার্কিন সে তার জীবদ্দশায়ই পরবর্তী প্রধান সরদার মনোনীত করে যাবার উদ্দেশ্যে সরদারদের একটি বৈঠক ডাকে। ঐ বৈঠকে রামুও এসে হাজির হয়। ইতোমধ্যে তার দশ বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

সুখদেবের কীধে ভর করে মতি সরদার বৈঠকে এসে বসল এবং পরবর্তী সরদার মনোনীত করার প্রস্তাব উত্থাপন করল। জনৈক সরদার সুখদেবের নাম প্রস্তাব করার চারদিক থেকে তার সমর্থন শুরু হয়ে গেল। এ সময় রামু দাঁড়িয়ে বলল, “তাইয়েরা! আপনারা সুখদেবকে প্রধান সরদার মনোনীত করতে চাচ্ছেন। এটা খুবই ভাল কথা। আমি নিজেও তাকেই উত্তম ব্যক্তি বিবেচনা করি। কিন্তু একটি বিষয়ের প্রতি আপনারদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হচ্ছে এই যে, সুখদেব আমাদের স্বজাতি নয়। তিনি উত্তরপক্ষ সমাজ থেকে এসেছেন। তাঁর দেখে রয়েছে উঁচু জাতির রক্ত। এমতাবস্থায় তিনি আমাদের প্রধান সরদার হতে পারেন কিনা, সে বিষয়ে আগে আলোচনা করা দরকার।”

পাঁচ পাশ থেকে চাঁৎকার করে বলে উঠল, “তিনি এখন আমাদের সমাজে মিশে গেছেন। আমাদের নিকট কেউ অক্ষুণ্ণ নয়।”

চারিদিক থেকে রামুর তীব্র সমালোচনা ও হেঁচো শুরু হল। রামুর সমর্থনেও দু’চার জন কথা বলতে চেষ্টা করল। ফলে উত্তরপক্ষ নিজ নিজ লাঠি টেনে নিয়ে লড়াই শুরু করতে উদ্যত হল। বৃদ্ধ মতি সরদার দুর্বল হয়ে তাদের বিরত করতে চেষ্টা করছিল।

কিন্তু হৈচৈ ও গোলমালে তার স্বর চাপা পড়ে গেল।

এ সময় সুখদেবের গভীর স্বর শোনা গেল। সুখদেব বলল, "আমার প্রিয় ভাইয়েরা! তোমরা দয়া করে আমার দু'টি কথা শোন। আমি বিদেশী ও বিজাতীয় মানুষ। এখানে এসে তোমাদের কাছে আশ্রয় পেয়েছি। তোমরা আমাকে ঘর বেঁধে দিয়েছ। আমার খাবার ও থাকার সকল ব্যবস্থা করেছে। সর্বোপরি আমি তোমাদের সকলের নিকট থেকে ভালবাসা ও সহানুভূতি পেয়েছি। আমি এর বেশী আর কিছুই চাই না। তোমাদের ভাই হিসাবে আমি তোমাদের সঙ্গে বসবাস করতে চাই মাত্র। আমার অনুরোধ তোমরা আমাকে সরদার নির্বাচন করো না। তোমাদের মধ্য থেকেই একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে সরদার মনোনীত কর। আমি সর্বদাই তোমাদের নির্বাচিত সরদারের সহযোগিতা করব।"

চারিদিক থেকে শব্দ উঠল, "না, না, তোমাকেই আমাদের সরদারী গ্রহণ করতে হবে।"

সুখদেব বলল, "আমি আপেই বলেছি, তোমরা যদি চাপ দাও, তাহলে আমাকে অন্যত্র চলে যেতে হবে।"

একজন সরদার বলল, "তাহলে তুমিই বলে দাও, আমাদের সরদার কে হবে?"

চারিদিক থেকেই ঐ একই শব্দ প্রতিধ্বনিত হল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা, তুমিই বলেদাও।"

সুখদেব সকলের মুখের দিকে একবার করে তাকিয়ে রামুর চেহারার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। সে যেন চোখের ভাষায় বলছে, "আমি এখানে রয়েছি। আমাকে মনোনয়ন দাও।"

সুখদেব মৃদু হেসে বলল, "যদি তোমরা আমাকে সরদার নির্বাচন করতে অনুরোধ কর, তাহলে আমি রামুর নাম প্রস্তাব করছি।"

সকলে এক বাক্যে সুখদেবের প্রস্তাব মেনে নিল। রামু সরদার নির্বাচিত হল। রামুর মাধ্যমে প্রধান সরদারের কার্যালয় স্থাপনের সময় সে মনে মনে ভাবতে লাগল, "এটা আমাকে জনপ্রিয়তা নয়, বরং আমার সরদার নির্বাচনের তিত্তর দিয়ে সুখদেবেরই বিজয় প্রমাণিত হ'ল।"

রামু সরদার হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য রাতদিন পরিশ্রম করতে লেগে গেল। পাহাড়, টিলা, উপত্যকার ঘোপঝাড় কেটে সেখানে ফসলের চাষ বাড়ানোর ফলে এলাকার লোকদের সুখ স্বাস্থ্য বেড়ে গেল। সে জনগণকে ছাগল ও ঘোষপালনের পরিবর্তে গো মহিষাদি পালনে উৎসাহিত করতে লাগল। ফলে কিছুকালের মধ্যেই চাষের কাজে এসব পশুর ব্যবহার শুরু হয়ে গেলে খাদ্য পুষ্টির মধ্যে দুধ ও মাখনের যোগান বেড়ে গেল। কুটিরের পরিবর্তে এখন বড় বড় মাটির ঘর তৈরী হতে লাগল। সর্বত্রই উন্নতির ছাপ সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য যোগ্য হয়ে উঠল।

সুখদেব এসব নীরবে দেখে যাচ্ছিল। ইতোমধ্যে সুখদেবের মাধব নামে একটি পুত্র এবং শান্তা নামী একটি কন্যা জন্মেছে। একদিন সুখদেব শিকড়ের একটি উপত্যকার গাছের ছায়ায় বসে মাধবকে নিয়ে খেলা করছিল। পাঁচ ফুটের কাছে বাস্তু ছিল। হঠাৎ রামু এসে সুখদেবের কাছে বসে পড়ল।

নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলার পর সে বলল, "ভাইয়া! আমি আমার লোকজনকে ঘৃণিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে চাই। উচ্চ জাতের লোকেরা আমাদের অক্ষুৎ করে রেখেছে। তারা আমাদের ঘৃণা করে। আমাদের সমতল ভূমি জোর জবরদস্তি করে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদেরকে বনজংগলে ঠাে দিয়েছে। এখানেও তারা আমাদের শান্তিতে থাকতে দেয় না। মাঝে মাঝে উচ্চ জাতের সৈন্যদল এসে আমাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। আমাদের সম্পদ লুট করে নেয়। তারা আমাদের পশুর চেয়েও অধম বিবেচনা করে। বল, তাদের হাত থেকে কি করে আমরা রক্ষা পেতে পারি?"

সুখদেব বলল, "উত্তম! আমিও তো তাই চাই। তুমি তোমার জাতিকে একতাবদ্ধ কর। তাদের যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দাও। তাহলে উচ্চ জাতের সৈনিকেরা এসে তোমাদের উপর অত্যাচার করতে পারবে না। তোমরাও তাদের মত নিজেদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর। সৈন্যদল গঠন কর। উচ্চ জাতের সৈন্য তোমাদের সমীহ করতে বাধ্য হবে।"

রামু বলল, "তোমার কথা সত্য হতে পারে। কিন্তু ও পথে অনেক বাধা বিপত্তি আছে। আমার বিশ্বাস তাদের শক্তির মূল উৎস হচ্ছে দেবতা। তারা দেবতার পূজা করে। আর দেবতার সম্ভ্রম রক্ষার জন্য যথাসর্ব্বথ ত্যাগ করতেও প্রস্তুত থাকে। আমি মনে করি, আমাদেরও কোন দেবতা থাকা দরকার। দেবতার শক্তি লাভ করলে আমরা শীঘ্রই ওদের পরাস্ত করতে পারব।"

সুখদেব বলল, "দেবতার কোন শক্তি নাই। ওটাতো পাথরের মূর্তি। একতাই আসল শক্তি।"



রামু বলল, "আমি নিজ চোখে দেবতার শক্তি দেখেছি। তুমি হয়ত শুনেছ যে, আমাকে এলাকার লোকেরা নির্বাসিত করেছিল। সে সময় আমি এক শহরের নিকটে আমাদেরই স্বজনদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তারা বর্ণ হিন্দুদের দাসত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। সেজন্য সমাজ তাদেরকে শহরের বাইরে অনুপত্ত প্রজা হয়ে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছে। তারা চাষবাস করে। উচ্ছ্রাতের লোকদের কাই ফরমাসি খাটে। তাদের কর দেয়। কিন্তু এদের ছায়া মাড়ালে উচ্ছ্রাতের লোকদের চান করতে হয়। তারা শহরে যাবার দরকার হলে, পায়ে ঘটা বেঁধে যায়। ঘটার টুনটুন শব্দে উচ্ছ্রাতের লোকেরা ছোট ছাতের ছায়া থেকে দূরে থাকার সুযোগ পায়। ছোট ছাতের লোকেরা কোন মন্দিরের নিকট যেতে পারে না। দেবতার কীর্তি ও ভজন সংগীত শোনা তাদের জন্য নিষিদ্ধ। যদি তারা শুনে, তাহলে তাদের কানে সীসা গালিয়ে দেলে দেয়া হয়। দেবমন্দিরের নিকট দিয়ে যাতায়াত করলে তাদের ধরে নিয়ে বলিদান করা হয়। আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, কালীদেবীর পূজা করেই তারা এত শক্তি অর্জন করেছে। আমি সিদ্ধান্ত করলাম, কালীদেবীর মূর্তি দেখার থেকে উঠিয়ে আমাদের এলাকার নিয়ে আসব। এক রাত্রিতে আমি পা টিপে চুপ মন্দিরে গেলাম। মন্দিরের প্রহরীগণ সে সময় বেহুশ হয়ে ঘুমাছিল। ধীরে ধীরে আমি মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলাম। উচ্ছ্রাতের উপরে কালীদেবীর মূর্তি কিছু বেয়ে করে দাঁড়িয়েছিল। তার চেহারা সিন্দুরের রঙে রাঙা। প্রথমে ভয় পেলেও ধীরে ধীরে নিকটে গিয়ে দেবীর পায়ের কাছে মাথা নত করে প্রণাম করলাম। তারপর মূর্তি থেকে উঠিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গেই মূর্তির পেছনে বীধা একটি সূতের টানে ঢং ঢং করে মন্দিরের ঘটা বেজে উঠল। আমি পালাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু চারদিক অন্ধকার প্রহরী ও পূজারীগণ এসে আমাকে বেঁধে ফেলল। অনেক মারপিট করার পর তারা আমাকে একটি কুঠরীতে বন্দী করে রাখল। পরদিন পূরনত ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আমাকে কালীমন্দিরে বলি দেয়ার সিদ্ধান্ত হল। দিন কেটে গেলে রাত্রির শেষাংশে তারা আমাকে কালীমন্দিরে নিয়ে গেল। হাতের বীধন বেঁধে নিয়ে দুজন প্রহরী আমাকে সামনে হাঁটু পেড়ে বসতে ইশারা করল। সামনে কালীদেবীর জিহবা বের করে রক্ত পান করার জন্য আমার দিকে কটমট করে তাকান্বে। এক ব্রাহ্মণ খড়্গ হাতে মন্ত্র পাঠ করতে লাগল। কয়েকজন ব্রাহ্মণ আশে পাশে হাঁটু পেড়ে বসে জোড় হাতে দেবীর নাম জপ করেছে। জীবনের সকল আশাই শেষ। কয়েক মুহূর্ত পরেই ব্রাহ্মণের খড়্গ শূন্যে উঠে আমার গর্দানে নেমে আসবে। তারপরই আমার ইহনীলা সাক হয়ে যাবে। আমি এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। তাই তারা সকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনেই বলিদান শেষ করার জন্য ব্যস্ত ছিল। আমি কিছু ভাবলাম মরতেই যখন যাচ্ছি, তখন মেঘের মত মরব না। একটু চেষ্টা করে দেখা যাক না কেন? চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই বীচার আশায় দেহে প্রবল শক্তি ফিরে এলো। খড়্গ খড়্গখারী ব্রাহ্মণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার অস্ত্রটি ছিনিয়ে নিলাম এবং তা মাথার উপর তুলে ঘুরাতে ঘুরাতে সোজা দরজা অভিমুখে দৌড় দিলাম। ঘটনাটা

এত আকস্মিক ছিল যে, তারা ফণিকের জন্য হতচকিত হয়ে গেল। ততক্ষণে আমি দুটো কামরা ভিত্তিতে গিয়েছি। চারদিক থেকে শোর উঠল “ধর, ধর!” আমি মন্দির থেকে বের হয়ে প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়াতে লাগলাম। পেছনে বহু লোক ছুটে আসছিল। কিন্তু তারা তখনও বেশ দূরে। রাত্রির অন্ধকার তখনও কাটেনি। ছুটছি তো ছুটছিই। দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য। কোন খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখতে পেলাম, সামনে একটি নদী। মুহূর্ত মাত্র চিন্তা না করে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সীতলরাতে লাগলাম। ব্রাহ্মণের মতন নদীর তীরে এসে হাঁক ডাক শুরু করল, তখন আমি নদী পার হয়ে পুনরায় ছুটতে শুরু করেছি। কিছু দূর যাবার পরই একটি বস্তি পাওয়া গেল। সৌভাগ্যবশতঃ ওটা শূদ্রদের মহল্লা। যদিও তারা ব্রাহ্মণদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে তবু ব্রাহ্মণি বিবেচনা করে আমাকে অশ্রয় দিল। ঐ বস্তিতে কয়েকদিন লুকিয়ে থেকে কিছুটা সুস্থ হ'বার পর আমি নিজ বস্তিতে ফিরে আসি। আর ফেরার পথেই আমি স্মরণ করেছি যে, এখানেও আমি দেব-মন্দির স্থাপন করবো। আমাদের মধ্য থেকেই পুরুরী ও মন্দিরের সেবায়োক্ত নিযুক্ত হবে। দেবতার বলে বলিয়ান হয়ে আমরা আমাদের এলাকায় উন্নয়ন কাজ ত্বরান্বিত করবো। এখানে শহর গড়ে উঠবে। ব্রাহ্মণেরা আমাদের আর ঘৃণা করতে পারবে না। কিন্তু একাজে তোমার সহযোগিতা দরকার।”

সুখদেব বলল, “পাথরের এ দেবতার উপর আমার কোন আস্থা নেই। দেবতা মানুষে মানুষে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। দেবতা ব্রাহ্মণদের শিবিয়েছে, মানুষকে অক্ষুৎ ঘোষণা করতে। দেবতার পূজারীপণ অক্ষুৎ মানুষকে পশুর চেয়েও অধম বিবেচনা করে। তাই আমি তোমাদের এ সুখী সমাজে দেবতাকে টেনে এনে হিংসার বীজ বপন করতে চাইনা।”

রামু বলল, “তাহলে তুমি কথা দাও, আমি দেবমন্দির স্থাপন করলে তুমি আমার বিরোধিতা করবেনা।”

সুখদেব বলল, “না, আমি তোমার বিরোধিতাও করবো না। আমি নিজের কাজ নিয়েই সুখে আছি। তোমার কাজে সহযোগিতা বা বিরোধিতা কোনটিই আমি করবো না।”

রামু চলে যাবার পর পুঁই সুখদেবের নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, “মহারাজ! রামু হাত নেড়ে নেড়ে আপনাকে কি বলছিল?”

“সে তার নির্বাসিত জীবনের কাহিনী শোনাচ্ছিল।”

“তোমার সঙ্গে সুখ্যাবহার করেনি তো?”

“না, না।”

“আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, একখানি কুড়াল এনে তার মাথায় বসিয়ে দেই।”

“কেন? সে তো আমার সঙ্গে কোন অন্যায় ব্যবহার করেনি।”

“কথা, কিন্তু রামু সোজা লোক নয়। নিশ্চয় সে কোন বদ-মন্তলব নিয়ে এসেছিল।”

কয়েকদিনের মধ্যেই রামু একাকী টিলার উপর একটি বেদী তৈরী করল। চারিদিক রটিয়ে দেয়া হল, অতি শীঘ্রই ওই বেদীতে এক দেবতা অবতরণ করবেন। কেউ বলল, তোর বেলা তারা দেবতাকে নদীর ঘাটে স্থান করতে দেখেছে। স্থান শেষে দেবতা নদীতে ডুব মেয়েছে। কেউবা দেবতাকে টিলার উপরের ঐ বেদীতে বসে থাকতে দেখেছে। দিন কয়েক পর একদিন রামুর জৈরী পাথরের দেবতাকে সত্যি সত্যি বেদীর উপর সমাসীন দেখা গেল। পুরুষ-স্ত্রী, ছেলে-বুড়ো সবাই দেবদর্শনে হাজির হল।

পাঁচু হীপাতে হীপাতে এসে বলল, "ভাইয়া, দেবতা এসেছে। আমি নিজ চোখে দেখে এসেছি। মানুষজন সব গুদিকে ছুটে যাচ্ছে। তুমি যাবে, চল।"

সুখদেব বলল, "ভাই পাঁচু, তুমি যাও। আমি তোমার জেঁড়া-বকরীগুলো নিয়ে চরাতেযাই।" [www.banglabookpdf.blogspot.com](http://www.banglabookpdf.blogspot.com)

পাঁচু বলল, "ভাইয়া, আমি জানি, দেবতা যত বড়ই হোক, তোমার চেয়ে সে বড় নয়। তুমি যদি নারাজ হয়ে থাক, তাহলে আমি তার কখনো গমুখো হব না।"

সুখদেব বলল, "আমি নারাজ হলাম কোথায়।"

"ভাইয়া, দেবতা সম্পর্কে আমি তোমার কোন উৎসাহ দেখতে পাইনি। অনেকে তোমার নিকট এ সম্পর্কে জানতে এসেছে। কিন্তু তুমি তাদের প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেছ। আজ আমাকে বলতে হবে। দেবতার আসল ব্যাপারটি কি? আমার মনে হয়, তুমি কোন কিছু গোপন করছ।"

"তোমাকে কিছু বললে, তুমি তা গোপন করতে পারবে না।"

"ইচ্ছা করলে আমি গোপন করতে পারি। কিন্তু আমি কারো ভয়ে কোন কথা গোপন করতে চাই না।"

"তাহলে তোমার গুরুত্ব কানে কাজ নেই। বোকার মত তুমি কখন কি বলে বসবে, আর তার ফলে ফ্যাসাদ সৃষ্টি হবে।"

"না, আমাকে কলতেই হবে, ভাইয়া। আমি তোমার আদেশ কখনোই অমান্য করবো না।"

"তবে আমি এ দেবতা আকাশ থেকে অবতরণ করিনি। এটা আগেও পাথর ছিল। এখনও পুরনো আছে। শুধু রামু গুটাকে যন্ত্রপাতি দিয়ে মানুষের আকৃতি দিয়েছে।

হ্যাঁ, ভাই হবে। রামু তো সোজা মানুষ নয়। সে সকলকে বোকা বানাচ্ছে। তুমি

কথাটি ফাঁস করে দাও।

“না, আমি রামুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আমি কখনও তার দেবতার বিরোধিতা করবোনা।

সেই দিন বিকাল বেলা।

ঢিলায় বহু লোক সমাগম হয়েছে। রামু বক্তৃতা করে সকলকে বুঝাচ্ছিল যে, ঐ দেবতা তাদের জন্য বড় বড় মহল তৈরী করবে। এ জংগলে শহর তৈরী হবে। অত্যাচারী রাজা-মহারাজাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের রাজ্য ছিনিয়ে নেবে। সকলে দেবতার সামনে নত হয়ে প্রণাম করল। রামু আরও বলল, “দেবতাকে খুশী করলে আমাদের সকলের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে। আর দেবতা নারাজ হলেই আমাদের ক্ষতি হয়ে যাবে। সকলেই প্রতিদিন সকালে এখানে ছুটে আসবে।”

পাঁচুকে ঢিলার দিকে যেতে দেখে সুখদেবও সেদিকে হেঁচনা হল। পাঁচু সেখানে পৌঁছে কোন অঘটন ঘটতে পারে বলে তার আশংকা ছিল। লোকজন সুখদেবকে দেখে খুশী হল। অবশ্য রামু তার সেখানে যাওয়া পছন্দ করেনি। লোকজন সুখদেবকে ঘিরে দেবতা সম্পর্কে তার মতামত জিজ্ঞেস করল। সুখদেব বলল, “তোমরা যে নতুন শক্তি লাভ করছে সেজন্য আমি খুশী। কিছু-

কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ ঢিলার দিকে গোলমাল শোনা গেল। সুখদেব জিজ্ঞেস করল, “পাঁচু কোথায়?”

একজন বলল, “সে ঢিলার দিকে গেছে।”

সেখা গেল কয়েকজন যুবক পাঁচুকে মাঝা মেঝে মেঝে এদিকে নিয়ে আসছে। আর তার মাথা থেকে রক্ত ঝরছে।

সুখদেব এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, “ওর কি হয়েছে?”

রামু বলল, “তুমিই জিজ্ঞেস কর না, সে কি করেছে।”

সুখদেব পাঁচুকে জিজ্ঞেস করল, “তুমি কি করেছিলে পাঁচু?”

সে বলল, “কিছু না ভাইয়া, আমি শুধু দেখতে গিয়েছিলাম, দেবতা মাটির তৈরী না পাথরের।”

রামু সুখদেবের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে তাকাল। সুখদেব বলল, “পাঁচু কখনও দেবতা দেখেনি তো, সেজন্যই এ কাজ করেছে বলে মনে হয়।”

রামু বলল, “ভাল হতে পারে। শুকে ছেড়ে দাও। ভাইয়া সুখদেব! তুমি তাকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিও।”

“আজ্ঞা ঠিক আছে। পাঁচু, বাড়ী চল।”

সবাই বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। রামু বলল, “তোমরা যাও। আমি দেবতার সঙ্গে কিছু গোপনীয় কথা সেজে আসি।”

\* \* \* \* \*

রামু টিলার উপরের দিকে উঠে গেল। চারদিকে কেউ নেই। দেবতার সামনে বহু পাকা আম সাজানো রয়েছে ধরে ধরে। ঘরে তৈরী অন্যান্য মিষ্টান্নও দেয়া হয়েছে। দেবতার ভক্তগণই এসব নিয়ে গিয়েছে। রামু ভাল ভাল পাকা আম এবং মিষ্টি যথেষ্ট পরিমাণে গলধঃকরণ করে বলল, “দেবতা! তোমার নামে এসব মিষ্টি ও আম খুয়ে আমার পেট ভরে গেছে। আর খেতে পারছি না। তাই কিছু রইল, আর আমার আঁটিগুলোও সাজানো অবস্থায় ছেড়ে গেলাম। কাল সকালে এই আঁটিগুলো দেখে লোকে বুঝবে, তুমিই এসব সাবাড় করেছ। ব্রাহ্মণেরা তো তাই করে। তোমার নাম ভাঙিয়ে আমিও জ্বাতে উঠতে চাই। তোমার নামেই ধন সম্পদ ও রক্ষক কায়ম করতে চাই। তোমার অশেষ দয়া। এখন রাত অনেক হল। আজকের মুক্তবিদায় দাও।”

রামু বাড়ীর দিকে চলে গেল। পরক্ষণেই পাঁচু একটি ঝোপের ভিতর থেকে বের হয়ে এলো। দেবতার সঙ্গে রামুর আলাপ শোনার জন্যই সে সব টিপে টিপে এসে সেখানে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। রামুর কথা শুনে সব বিজ্ঞ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সে প্রথমত টুকরীর অবশিষ্ট আম এবং মিষ্টিগুলো খেয়ে সাবাড় করল। তারপর হাতের কুঠার খানা উঠিয়ে দেবতার ঘাড়ের সোঁতের আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে দেবতার মুণ্ডটি ভেঙ্গে হুড়মুড় করে नीচে পড়ে গেল। একসময় আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল। আকাশ ঘোর কালমেঘে আচ্ছন্ন ছিল। পাঁচুর ভয় হল। হয়ত তার এসব কাজ দেখে দেবতা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে। ভয়ে ভয়ে সে বাড়ীর দিকে ছুটতে লাগল। ততক্ষণে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ছুটে যেতে যেতে পাঁচুর মনে হতে লাগল, যেন দেবতাও তার পেছনে পেছনে ছুটে আসছে।

## পনর

আকাশ থেকে মুহূর্ত ধরে বৃষ্টি নেমে এলো। সুখদেব কুটিরে বসে চিন্তামগ্ন। মাধব ও শান্তা শুয়ে রয়েছে। কমল রান্না করছে। মাধব বলল, বাবা! আজ পাঁচু কাকা তো আসেনি।”

সুখদেব বলল, “বৃষ্টির মধ্যে হয়ত আসতে পারেনি। তুমি ঘুমাওনি এখনও?”  
মাধব বলল, “শান্তা চিমাটি কেটে আমাকে জাগিয়ে দিয়েছে, বাবা!”  
কমল শান্তাকে ধমক দিয়ে বলল, “দুইমি করোনা শান্তা। চুপ করে ঘুমিয়ে পড়।”  
সুখদেব বলল, “কমল! আমার মনে হচ্ছে, এখানে আর বেশী দিন থাকা যাবে না। দেবতার মন্দির নিয়ে আবার বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে। আমি যদি এখানে না এসে

তোমার স্বদেশীয় লোকদের সঙ্গে পাহাড় জংগলে বসবাস করতাম, তাহলে তাদের একটি উত্তম সৈন্যদলে পরিণত করে অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারতাম। কিন্তু আজ হয়ত তারা নেতার অভাবে উঁচু জাতের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে।”

কমল বলল, “শুসব নিয়ে আজ কেন ভাবতে বসেছ?”

সুখদেব বলল, “আমার কোন জ্ঞানি কেবল মনে হচ্ছে, এখানে আমাদের দিন কুটীরে এসেছে। বৃষ্টি বাদল খেমে গেলেই আমি এ জায়গা ছেড়ে পুরানো জায়গায় চলে যেতে চাই।”

কমল বলল, যেতে চাইলে যাবে, আমার তো তা নিয়ে কোন অধিকার নেই।

এ সময় বৃষ্টির মধ্যে শপশপ করে হেঁটে পাঁচু এসে ঘরে ঢুকল। তার গায়ের কাপড় ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছে। সুখদেবকে লক্ষ্য করে সে বলল, “তাইয়া! নদীতে বান ডেকেছে। গ্রামে জল ঢুকে পড়েছে। এখানে থাকা আর সম্ভব নয়। লীগীর তৈরী হয়ে নাও। আমি একটুনি গাধাগুলোকে সাজিয়ে নিয়ে আসছি।”

কথা কয়টি বলেই পাঁচু অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুখদেব নরজা খুলে বাইরে এসে দেখতে পেল মুসলখারে বৃষ্টি পড়ছে। উঠানে পানি জমা হয়ে গেছে। দূরে লোকজনের হৈ চৈ শুনা যাচ্ছে। সকলেই উপত্যকা ছেড়ে উঁচু টিলার দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। কমল উঠে হাঁড়িকুড়ি বেঁধে নিল। অন্ধকারে পাঁচু তার গাধা ও বকরির পাল নিয়ে চলে এলো। গাধার পিঠে সব মাল পরে জলে দিয়ে তারা সকলে টিলার দিকে এগিয়ে চলল। অনেক কষ্টে উঁচু এক টিলায় উঠে একটি গুহায় তারা রাত্রির মত আশ্রয় নিল।

পরদিন বৃষ্টি খেমে গেলে আকাশ সফলকরে পরিষ্কার হয়ে উঠল। কিন্তু নদীর বধি ছাপিয়ে পাহাড়ী ঢলের স্রোতে সমগ্র নিম্ন এলাকা পুঙ্খিত হয়ে গেল। আরো কয়েকজন লোকের সহায়তায় বনের ঘাসপালা ও ডালপালা দিয়ে পাঁচু একটি কুটির তৈরী করে ফেলল। সুখদেব ও কমল সেই কুটিরে স্থানান্তরিত হলে পাঁচু নিজে একটি গুহায় আশ্রয় নিল।

ওদিকে রামু সকালে দেবতার টিলায় গিয়ে দেখতে পেল, তার দেবমূর্তির মুক্ত নেই। সে সুখদেবকে একদা সোধী সাব্যস্ত করল। তার সন্দেহ হল, সুখদেব তার গোটা পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য এ জঘন্য কাজ করেছে। তাই রাত্রির অন্ধকারে একখানা দা হাতে নিয়ে সে সুখদেবের তালাশে বেরিয়ে পড়ল।

এই সময় সুখদেব ও কমল নিদ্রামগ্ন ছিল। রামু দা হাতে কুটিরে প্রবেশ করল এবং সুখদেবের মাথায় প্রচণ্ড একটি আঘাত করল। বিকট চীৎকার শুনে সঙ্গে সঙ্গে কমল জেপে উঠে রামুকে পলায়নরত দেখতে পেল। সেও চীৎকার করে বলে উঠল, “কোথায় পালাচ্ছ দস্যু!” বলেই কমল ছুটে গিয়ে তার রাস্তা আগলে দাড়িয়ে চীৎকার করতে লাগল। রামু একবার ফেপে গিয়ে হাতের দাখানা দিয়ে কমলের ঘাড় আঘাত করতে চেয়েছিল। কিন্তু স্ত্রীলোকের উপর আঘাত করতে তার মন সম্মত হল না। সে তাকে

জোরে ধাক্কা মেয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে পানিতে ঝপিয়ে পড়ল।

ততক্ষণে পাঁচু ছুটে এসেছে। এসেই ব্যাপরটা বুঝতে পেরে কমলকে বলল, ভূমি ভাইয়ার কাছে যাও। আমি ঐ ব্যাটাকে দেখছি। বলে সেও মুহূর্তে পানিতে ঝপিয়ে পড়ল।

রামু ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে। কেউ তার পেছনে আসছে না মনে করে সে হাতের দা ফেলে দিয়ে স্তম্ভ গতিতে সাতিরিয়ে চলেছে। টের পেয়ে পাঁচু তার স্নাতিকারের গতি আরো বাড়িয়ে নিল। রামুর বেশ কিছুটা নিকটে পৌঁছে সে জোরে হাঁকি নিল, "দাঁড়াও, রামু! আজ তোমার পরীক্ষার দিন"

রামু পাঁচুকে দেখতে পেল। সে দেবতার টিলার দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু টিলা তখনও অনেক দূর। শুনিকে পাঁচু স্তম্ভ এগিয়ে আসছে। তাই সে একই কন্ঠ গভীর পানিতে মজবুত হয়ে দাঁড়াবার আশায় এনিক শুনিকে পা ঠেকানোর চেষ্টা ত্যাগ করতে লাগল। পাঁচু আক্রমণ করল। কিন্তু রামু তার লম্বা হাতের সাহায্যে পাঁচুর মাথা চেপে ধরতে চেষ্টা করল। পাঁচু টুপ করে পানির নীচে ডুবে গেল। রামু এক ফাঁকে আবার কিছুটা কন্ঠ গভীর জায়গা খুঁজে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু পাঁচু তার পেছন দিক থেকে এসে পানির নীচেই পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে হেচকা হানে তাকে পানির নীচে নিয়ে গেল এবং নিজেই সামলে নেবার আগেই রামুর পলকটিপে ধরে পানির নীচে ডুবিয়ে রাখল। নাকমুখ নিয়ে ভারভর শব্দে পানির বুদবুদ শব্দে উঠে এসে কিছুক্ষণের মধ্যেই রামু হির হয়ে গেল। রামুকে ওখানে ছেড়ে দিয়ে পাঁচু পুনরায় কুটিরের দিকে ছুটে চলল। কমল সুখদেবের মাথায় পটি বেঁধে দিয়েছে। তখনও কিছু কিছু রক্তক্ষরণ হচ্ছে। মাধব ও শান্তা বারবার কমলকে জিজ্ঞেস করছে "বাবার কি হয়েছে? বাবা কথ বলছে না কেন?"

পাঁচু ফিরে এসে বলল, "ভাইয়া রামুকে শেষ করে দিয়ে এসেছি।" কিন্তু সুখদেবের আঘাতের দিকে তাকিয়ে সে অথবো উঠল। সুখদেবও পাঁচুর দিকে চোখ মেলে তাকাল। দু'চোখের কোন বেয়ে তখন অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। ইশারায় সে পাঁচুকে মাধব, শান্তা ও কমলের দিকে লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ করল। পরে কমলকে নিজের লোকদের নিকট চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। দুপুরের কাছাকাছি সময় সুখদেব এই নখর পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করল।

## ষোল

কমল মালপত্র গোছ গাছ করে তৈরী হয়েই বসেছিল। পাঁচু তার মেঘ, বকরী ও গাধাগুলো নিয়ে এসে হাকিরি হল। সামান্য যা মালপত্র ছিল তা একটি গাধার পিঠে বেঁধে দিয়ে কমল শান্তাকে নিয়ে অন্য একটি গাধার পিঠে চড়ে বসল। পাঁচু ও মাধব অপর গাধাটির উপর বসে মেঘ বকরীগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। বনজংগল-পাহাড়-টিলা ডিকিয়ে কমল এক সময় সুরমা নদীর স্রোতধারা দেখতে পেল। নদীর কিনারা বরাবর তারা কয়েক দিন ধরে চলতে লাগল। পথে একই গ্রামে জেলে ও মাঝির ঘরে তারা আতিথ্য গ্রহণ করল। জেলে তাদের সকল প্রকার যত্নসেবা করল। বুড়ো জেলে সরদার বলল, “আপনারা আমাদের সঙ্গে এ গ্রামেই বসবাস করুন। এখানে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না।”

পাঁচু ও তাই পছন্দ করল। গোটা গ্রামের সব নরনারী তাদের আদর আপ্যায়ন করল। কমলের স্বগোষ্ঠীয় লোকজন কোথায় বসবাস করছে তারা তা জানেনা। এমতাবস্থায় নিজের এলাকায় ফিরে গিয়ে কোন লাভ নেই। একদিন তাই পাঁচু বলল, “বোন কমল! এ গ্রামে তো সকলেই আমাদের লোক। শহরের সত্যতা এখানে আসেনি। দেবদিকের উপদ্রবও এখানে নেই। এখানে বসবাস করলে মঙ্গল হয় না।”

কমল বলল, “সবই হতে পারতো পাঁচু ভাই। কিন্তু তোমার দাদার অন্তিম ইচ্ছা ছিল, জেলে-মেয়েদের নিয়ে আমি যেন আমার নিজ বংশের লোকদের নিকট চলে যাই। তার শেষ ইচ্ছা আমি কি করে অপূর্ণ রাখতে পারি?”

পাঁচু বলল, “তুমি তো কাল সন্ধ্যায় জেলেরা বলছে তোমার জন্মস্থান যৌবনপুরে এখন শহর গড়ে উঠেছে। সেখানকার অক্ষুণ্ণ সমাজ উচ্চ জাতের দাসত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। দাদা তো এসব খবর জানতেন না। কাজেই সেখানে গিয়ে আমাদের দাঁড়াবার জায়গা হবে কি?”

কমল বলল, “যদি শহর হয়ে থাকে তবে আমি শহরের বাহিরে কোথাও ঘাস-লতা নিয়ে একটি ছোট্ট বাড়ির তৈরী করে নেব। তবু আমার শৈশবের খেলাধুলার স্থান, আমার স্বপ্নীয় স্বামীর সঙ্গে যেখানে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, সে জায়গায় আমি মুখটি বুজে পড়ে থাকতে চাই।”

পাঁচু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “আচ্ছা, তাই হবে।”

জেলাজেলার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে তারা আবার চলতে শুরু করল। ছয় ফ্রোশ পথ চলার পর তারা একটি ছোট্ট শহরে গিয়ে পৌঁছল। শহরটির নাম যৌবনপুর। নুতন



দালান-কোঠা, হাট-বাজার শু দেবমন্দিরের জৌলুশে সমগ্র এলাকাটি এখন আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। শহরের প্রান্তে একটি কিল। কিলের অপর পাশে বস্তি।

সূর্য অস্ত হাবার আগেই পাঁচু, কমল, মাধব ও শান্তা গাধা ও মেঘ-বকরী নিয়ে বস্তিতে প্রবেশ করলে কয়েকটি নেড়ী কুকুর খেঁচ খেঁচ করে তাদের সাদর স্বাগতগণ জনালো। বস্তির ছেলেমেয়েরা তামাশা দেখার জন্য ছুটে এলো। বয়স্ক নর-নারীরাও একে একে এগিয়ে এসে তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করল। কমল কারো প্রশ্নের উত্তর দিল না। কিলের নিকটে এক জায়গায় অনেকগুলো গাছ গাছড়া একত্রে দাঁড়িয়ে আছে। কমল ঐ ছায়া ঢাকা গাছগাছালি পরিবেষ্টিত জায়গাটিই পছন্দ করল।

পাঁচু পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে এলো। রাত্রিটি পাছের নীচে বিছানা পেতে কাটিয়ে দিয়ে সকালে বস্তির কয়েকজন স্বপোত্রীয় লোক নিয়ে পাঁচু ঐ জায়গায়ই দু'টি কুঁড়ে ঘর তৈরী করে ফেলল। কমল খোজ খবর নিয়ে জানতে পারলো যে, তার বাবার বন্ধু রবীন সরদার বস্তির অপর প্রান্তেই বাস করে। পাঁচুর মারফত তাকে খবর দিলে রবীন সরদার এসে পরিচয় জানতে চাইলে কমল বলল, "কাকা বাবু! আমি সাধন সরদারের মেয়ে, কমল।"

রবীন অত্যন্ত বিস্ময়ভিক্ষিত হয়ে বলল, "কমল! তুমি বেঁচে আছ মা? আমরা তো মনে করেছিলাম রাজার সৈনিকেরা তোমাদের খঁজে ফেলেছে।"

কমল চোখের জলে রবীনকে তার জীবনের করুণ কাহিনী শোনাল। সকল কথা শুনে রবীন সরদার বলল, "কমল! তোমার বাবা বেঁচে নেই। কিন্তু আমি তো বেঁচে আছি। তোমার কোন অসুবিধা হবে না এখানে, এখন রাজার মনোভাব অনেক বদলেছে। বিশেষ করে যৌবনপূরের নগরপতি শুবই-তাল মানুষ। তিনি এখানে আসার পর থেকে রাজার সৈনিকেরা অত্যাচার বন্ধ করেছে। শূদ্রদের প্রতি সামান্য অত্যাচার করলেও তিনি অত্যাচারীদের কঠোর শাস্তি দেন। আমরা তাদের দেবমন্দিরে যেতে পারি না বটে। কিন্তু আমাদের সেখানে হাবার কোন দরকারও নেই।

তোমার যা কিছু প্রয়োজন হয় আমাকে জানাবে। আমি সকলকেই জানিয়ে দেব যেন তারা প্রয়োজনে তোমার সাহায্য করে।

## সতের

কুটিরের সামান্য দূরে ছিল। ঝিলের ওপারেই শহর। শহরের বাসিন্দা রজনী ও তার স্ত্রী সাবিত্রীর একমাত্র কন্যা মোহিনী সকালে ঘুম থেকে জেগেই মাঝে জিজ্ঞেস করল, "মা বাবা কোথায়?"

মা বলল, "তোমার বাবা মন্দিরে গেছে।"

"আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বললে না কেন?"

"বলেছি বাছা! তুমি মুখ-হাত ধুয়ে দুধ খেয়ে মন্দিরে গিয়ে তোমার বাবাকে দেখতে পাবে। এত সকালে তুমি কি করতে সেখানে যাবে?"

"সে কথা শুনে তোমার কাজ নেই, আমি মুখ-হাত ধুয়ে প্রসি। তুমি দুধ নিয়ে এসো।"

সাবিত্রী দুধ নিয়ে আসতেই নগরপতির দশ বছর বয়সের ছেলে রনবীর এসে জিজ্ঞেস করল, "মোহিনী কোথায় খুঁজি মা?"

"বস, বাবা! মোহিনী হাত-মুখ ধুয়ে এখনই আসছে।"

সাবিত্রী দু'টি বাটিতে গরম দুধ নিয়ে আসে রেখে দিল। মোহিনী হাত-মুখ ধুয়ে এসে রনবীরকে দেখতে পেয়ে খুব খুশী হয়ে উঠল। মোহিনীর বয়স আট বছর। দুজনে একত্রে দুধ পান করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। মোহিনী মন্দিরে যেতে চাইলে রনবীর বলল, "ঝিলের মধ্যে অনেক পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। চল, ফুল তুলে নিয়ে মন্দিরে যাই।"

"আমি জল দেখে ভয় পাই।"

"দূর পাগলী! তুমি ঝিলে নিম্নে যেতে হবে কেন? দূরে দাড়িয়ে থাকবে। আমিই ফুল তুলে নিয়ে আসব।"

রনবীর ও মোহিনী ঝিলের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল। মাধব সে সময় ডুব দিয়ে শালুক তুলছিল। মোহিনী বলল, "রনবীর! আমি শালুক নেব।"

রনবীর ঝিলে নেমে শালুক তোলায় চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

মাধব এগিয়ে এসে বলল, দাঁড়াও, আমি তুলে দিচ্ছি।"

বলতে বলতেই মাধব ডুব দিল। অনেকক্ষণ ডুবে থাকতে দেখে মোহিনী ভয় পেয়ে বলে উঠল, "বোঁচারী ডুবে মারা যায় নি তো? মাধব চারটি শালুক নিয়ে তেঁসে উঠল। রনবীর ও মোহিনীকে মোট দুটো করে শালুক দিল। শান্তা আগেই কয়েকটি শালুক হাতে তীক্ষ্ণ দাড়িয়ে ছিল।

মোহিনী বলল, "চল, রনবীর এবার আমরা বাড়ী যাই।"

মাধব ঝট পট ওপরে উঠে রনবীরকে বলল, "তুমি বশী বাজাতে পার?"

রনবীর মাথা দুলিয়ে তার অপারগতা প্রকাশ করলে মাধব এক লাফে ঝিলের কিনারার একটি গাছে উঠে গেল এবং সেখান থেকে তার কুপ্ত জামাটি নিয়ে नीচে নেমেএলো।

জামার পকেট থেকে একটি ছোট বাশের বাশী বের করে মাধব গুতে সুর দিতেই রনবীর ও মোহিনী মুগ্ধ হয়ে গেল। মাধবের বাশীর সুর খুবই মধুর। তাই মোহিনী ও রনবীর তনয় হয়ে গুনতে লাগল। মাধব তার কৃতিত্ব দেখানোর এ সুবর্ণ সুযোগে প্রতিপক্ষকে আকৃষ্ট করে ফেলল। বাশীর আওয়াজ শেষ হইতেই রনবীর এগি জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কি?"

"মাধব।"

"তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

"ঝিলের ওপারের বস্তিতে।"

"তুমি আমাকে বাশী বাজানো শেখাবে?"

"শিখতে চাও? নিশ্চয়ই শেখাবো। তুমি কাল এসো।"

"এটি কে? তোমার বোন?"

"হ্যাঁ।"

মাধব রনবীরকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কি?"

"আমার নাম রনবীর।"

"এই মেয়েটি কি তোমার বোন?"

"না, আমার বোন নয়।"

"তোমরা কোথায় থাক?"

"শহরে।"

"শহর খুব সুন্দর! তাই না?"

"কেন, আমাদের শহর তুমি কোনদিন দেখ নি?"

"কোনদিনও না, পড়ি কখনও বলে, শহরের লোক নাকি মানুষ খেয়ে ফেলে।"

"দূর পাগল! চল, আমি তোমাদের শহর দেখাবো।"

"ঠিক আছে, পড়ি কখনও জিজ্ঞেস করে একদিন তোমার সঙ্গে যাব।"

মাধব বলল, "বকের বাচ্চা দেখবে?"

রনবীর বলল, "আমি নয়, কাল এসে দেখব।"

মোহিনী বলল, "আমি এখনি বকের বাচ্চা দেখব।"

অগত্যা রনবীরকেও বকের বাচ্চা দেখতে রাজী হতে হল। মাধব তাদের সঙ্গে নিয়ে ঝিলের পারে একটি ঝোপের মধ্যে ঢুকে বকের বাসা থেকে দু'টি ছোট ছানা বের করে আনল।

মোহিনী বলল, "এখনও ওদের চোখ ফোটেনি দেখছি?"

রনবীর বলল, "তুমিও যখন ছোট ছিলে তখন তোমার চোখও এমনি বন্ধ ছিল।"

“বারবার হাঁ করছে কেন?”

মাধব বলল, “এদের ক্ষিদে পেয়েছে, খাবার চাচ্ছে।”

রনবীর বলল, “ওদের বাসায় রেখে দাও। ওর মা এসে এদের মুখে খাবার ভূলে দেবে।”

মোহিনী জিজ্ঞেস করল, “রনবীর! বকের বাচ্চা কে ভৈরী করেছে?”

রনবীর বলল, “ভগবান।”

মাধব জিজ্ঞেস করল, “ভগবান কে?”

মোহিনী বলল, “তুমি ভগবান কে জান না? তিনিই তো আমাদের সৃষ্টি করেছেন।”

“আমাকে কে সৃষ্টি করেছে?”

“ভগবান।”

“তিনি কোথায় থাকেন?”

“মন্দিরে।”

“মন্দির কোথায়?”

“এই তো শহরে। চল তোমাকে আজ ভগবান দেখিয়ে দেব।”

“না, না, মন্দিরে দেবতা আছে। দেবতা আমাকে খেতে ফেলবে।”

“দূর! দেবতা আবার মানুষ খায় নাকি?”

“পচি কাকা তো ভাই বলে।”

“তোমার পচি কাকা জঙ্গলী টকলী হবে হুজুর।”

“জঙ্গলী কাকে বলে?”

“যারা শহর দেখেনি, বন জঙ্গলে বাস করে।”

“তাহলে তো আমিও জঙ্গলী।”

“না, না, তুমি জঙ্গলী হতে যাবে কেন? তুমি আমাদের শহরের কাছেই বাস কর।

তোমার গায়ের রং শহরের ছেলেদেরই মত। চল, তোমাকে শহর ও ভগবানের মন্দির দেখিয়েদেব।”

মাধব বলল, “চল যাই।”

শান্তা বলল, “আমি ঘুরে চলে যাব।”

মাধব বলল, “তা কখন? আমি এদের সাথে মন্দির দেখে ফিরে আসছি।”

## আঠার

রনবীর ও মোহিনীর সঙ্গে মাধব ভয়ে ভয়ে মন্দিরে প্রবেশ করল। শংকর ও গোপাল নামের দুজন পূজারী বাইরের আমগাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে ছিল। মন্দিরের বিশাল কামরায় দেবতাদের নানা আকৃতির মূর্তি দেখে মাধব ঘাবড়ে গিয়ে বলল, “আমরা খুব ভয় করছে।”

মোহিনী তাকে সাহস দিয়ে বলল, “ভয়ের কিছু নেই। দেবতারা খুব ভাল। কারো ক্ষতি করে না।”

“দেবতা ! ” মাধব আশ্চর্যাবৃত্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, “আমরা আমাকে ভগবান দেখতে নিয়ে এসেছিলে। দেবতা কেন ?”

মোহিনী বলল, “ওই দেখ, সব চাইতে যে দেবতা বেশী পুরা তিনিই ভগবান। চল, নিকটে যাই। তুমি অনর্থক ভয় পাচ্ছ কেন ?”

ধীরে ধীরে মাধব, মোহিনী ও রনবীরের সঙ্গে দেবতার কাছে গেল। দেবতার পায়ে হাত বুলিয়ে বলল, “সত্যি ভগবান খুব সুন্দর। আজ্ঞা, ভগবান নড়াচড়া করছে না কেন ? ভগবানের শরীর ভীষণ শক্ত। পাথরের তৈরী নাকি ?”

মোহিনী বলল, “আহা! অমন করে বরো না। ভগবানজী রাগ করবেন। এখানে এসে মানুষ ভজন গায়। এসো আমরাও ভজন গাইব।”

“ভজন কি ?”

“তুমি ভজনও জান না। আজ্ঞা, আমরা গাই। তুমি শোন।”

রনবীর ও মোহিনী মিষ্টি সুরে ভজন গাইতে শুরু করলে মাধব মনে মনে দু’ একবার আবৃত্তি করার পর তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দিল। ভজন শেষে মাধব বলল, “আমি ভগবানের সামনে বশী বাজায় কেমন ?”

রনবীর বলল, “আরে হ্যাঁ! বাজাও, ভগবান খুব খুশী হবেন।”

মাধব মধুর সুরে বশী বাজাতে শুরু করল। ওদিকে বশীর আওয়াজে মুগ্ধ শংকর ও গোপাল জেগে উঠল। গোপাল বলল, “শংকর! এত মিঠা সুরে বশী বাজায় কে ?”

শংকর লাঠি হাতে মন্দিরের দিকে ছুটে যেতে যেতে বলল, “হায় হায়রে! সব নষ্ট হয়ে গেল। মন্দিরের পায়ে যে শূত্র ছেলেটি বশী বাজায়, এটা তো তারই সুর মনে হচ্ছে!”

শংকর ব্যতিব্যস্ত হয়ে মন্দিরে প্রবেশ করল। পেছনে পেছনে গোপালও ছুটে এলো।

শুদের দেখামাত্র মাথবের হাত থেকে বশিটি মাটিতে পড়ে গেল। সে রনবীরের পেছনে গিয়েদাড়া।

মাথবকে দেখামাত্রই শংকর ভয়ানক রেগে উঠে লাঠি উঁচু করল এবং রনবীর ও মোহিনী কোন কিছু ভাববার আগেই মাথবের মাথায় আঘাত করল। মাথব ঘুরে মাটিতে পড়ে গেল। তার মাথা থেকে ফিনুকি দিয়ে রক্ত ছুটল। শংকর আবার লাঠি উঁচু করলে, গোপাল তাকে ধরে ফেলল। বলল, 'দেখ শংকর। এটা ভগবানের মশি। এখানে রক্তপাত করা মহাপাপ।'

রনবীর যদিও ছোট তবু তার গায়ে ক্ষত্রিয়ের রক্ত রয়েছে। তারাই সেনা নগরপতির একমাত্র ছেলে। তার সামনে একজন সামান্য পূজারীর এই মূর্খ আচরণ খুবই আপত্তিকর ছিল। সে গর্জন করে উঠল, "তুমি শুকে মারলে কেন? ও তোমার কি ক্ষতি করেছে?"

পূজারী রাগের মাথায় নগরপতির ছেলেকে চিনতে পারেনি। তাই বলে উঠল, "তুমিই কি তাকে এখানে নিয়ে এসেছ?"

"হ্যাঁ, আমিই নিয়ে এসেছি। এক্ষুণি আমি গিয়ে তাকে নিয়ে আসছি, দাঁড়াও। তিনি তোমার ঠাকুরগিরি বের করে দেবেন।"

শংকর বলল, "আরে নিয়ে এসো তোমার মশি। তোমার বাবাকেও দেখে নেব।" বলতে বলতে সে মাথবের পা ধরে টেনে মশির বাইরে নিয়ে গেল। ভগবানের বেদী থেকে শুরু করে বাইরে আমগাছের ছায়া পর্যন্ত মাথবের ফাটা মাথার রক্তে একটি মোটা রেখা তৈরী হল। রনবীর অত্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে উঠল। মোহিনী অসহায়ভাবে কাদিতে কাদিতে সেখানে পৌঁছল। গোপাল ছিল পেছনে।

বাইরে গিয়ে শংকর রনবীরকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "তুমি কেন এ শূত্র ছেলেকে ভগবানের মন্দিরে নিয়ে এসেছ?"

গোপাল এগিয়ে এসে রনবীরের কাঁধে হাত রেখে বলল, "এই ছেলে, তুমি পালিয়ে যাও।"

রনবীর অপমান বোধ করল। সে গর্জন করে বলে উঠল, "সামান্য একজন পূজারীর ভয়ে আমি পালিয়ে যাবো? তাকে সমুচিত শিক্ষা না দিয়ে আমি কিছুতেই যাবো না।" বলতে বলতেই একখণ্ড পাথর তুলে সে শংকরের মাথাল লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। পাথরের আঘাতে শংকরের মাথা কেটে গেল এবং সে দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সে ফেপে উঠে লাঠি হাতে রনবীরের নিকে ছুটে গেল। রনবীর আরও একটি পাথর হাতে নিয়ে বলল, "আয়, এগিয়ে আয়। আর এক পা এগুলোই তোমার মাথা আমি ঠাণ্ডা করে দেব, অংলী পূজারী কোথাকার।"

গোপাল এগিয়ে গিয়ে শংকরের হাত ধরে বলল, "চোখের মাথা খেয়েছ নাকি।"

সেখতে পার না, শুটা কে? শুটা যে নগরপতির ছেলে।”

একথা শোনামাত্রই শংকরের হাতের লাঠি মাটিতে পড়ে গেল। তখনও সে ফেপেই ছিল। কিন্তু নগরপতির ছেলের দিকে এগিয়ে যাবার তার আর সাহস হল না। বলল, আমি পুরুত ঠাকুরের কাছে গিয়ে এক্ষুণি নালিশ করব।”

গোপাল বলল, “পুরুত ঠাকুরের নিকটে নালিশ করলে কোন লাভ হবেনা। উণ্টো ঝিল থেকে জল টেনে এনে পুরো মন্দিরটিই তোমায় ধুইয়ে দিতে হবে। ছাছড়া আমরা যে ঘুমিয়ে ছিলাম, সে অপরাধে দুজনারই চাকরী যাবে। পুরুত ঠাকুর রামদাসের কোপ দৃষ্টিতে পড়ার চাইতে, আমাদের দুজনকেই বরখাস্ত করে, নতুন দু'জন গুজারী নিয়োগ করাই ভাল বিবেচনা করবেন। আমরা ঘুমিয়ে না থাকলে, শুন ছেলে মন্দিরে প্রবেশ করতেই পারতো না। নিজের সোষ চাপা দেবে কি করে?”

শংকর এবার চুপসে গেল। রনবীর মাথবকে উঠাতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার মাথা থেকে তখনও রক্ত ঝরে পড়ছে।

মোহিনী নিজের শুড়না এগিয়ে দিলে রনবীর তা দিয়ে মাথবের মাথা বেঁধে দিল। তারপর তাকে ধরে নিয়ে রনবীর ও মোহিনী ঝিলের দিকে এগিয়ে চলল। শুখানে কমল অস্থিরভাবে মাথবের জন্য পায়চারী করছিল। দূর থেকে তাদের সেখতে পেয়ে ছুটে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, “তোমরা কোথায় গিয়েছিলে? ওকি? তোকে কে মেরেছে? তোর মাথায় রক্ত কেন?”

মাথব মায়ের কোলে উঠে কুণিয়ে কুণিয়ে কানিতে লাগল। মোহিনী বলল, “শংকর মেরেছে।”

“শংকর! শংকর কে?” কমল প্রশ্ন করল।

“শংকর মন্দিরের গুজারী ঠাকুর। আমরা মাথবকে ভগবানের মন্দির সেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম কিনা।”

“তোমরা কে?”

“আমার নাম মোহিনী আর ও রনবীর”

“রনবীর তোমার ভাই?”

“না, আমার কোন ভাই নেই। রনবীর ও আমি এক সঙ্গে খেলা করি।”

এবার মোহিনী কমলকে জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি মাথবের মা?”

“হ্যাঁ, মা আমিই ওর মা।”

“তাহলে মাথবকে আপনি বাড়ীতে নিয়ে যান। রনবীর শংকরের শাস্তি দিয়েছে। তার বাবাকে বলে শংকরকে আরও সাজা দেয়া হবে।”

কমল চোখ মুছে বলল, “এ কাপড়টি কার?”

মোহিনী বলল, “আমার গড়না, গুটা খুলে দেবার দরকার নেই। মাধবের মাথায় বধিখাক।”

“তোমার মা তোমাকে বকবে না?”

“মা কিছু বলবে না, আমি কত কিছু হারিয়ে ফেলি। আমার মা কিছু বলে না। আর গুটার জন্য কি বলবে?”

রনবীর এবার বলল, “বুড়ীমা! আমরা কাল এসে মাধবকে দেখে যাব। তার জন্য গুযথও নিয়ে আসব।”

কমল মাধবকে নিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ঘরের দিকে রওনা হল। মোহিনী ও রনবীর শহরের দিকে চলে গেল।

কমল এক মুহূর্ত মোহিনী ও রনবীরের দিকে দৃষ্টি মেলে রাখল। চেহারা-সুরত ও গায়ের রং-এর তুলনায় মাধব গুনের চাইতেও সুন্দর। কিছু অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস। মাধব কমলের পেটে জন্মানোর দরুন আজ ঘনিষ্ঠ। যদি সুখদেব নীচজাতের কমলকে বিয়ে না করতো, তাহলে সুখদেবের সন্তানেরা সমাজের উচ্চ স্তরেই বাস করতে পারত। কমলের মনে হল, তার নিজেরই ছিন্নো আজ তার প্রিয় সন্তান দু’টি অস্পৃশ্য হয়ে পড়েছে।

## উনিশ

অর্জুন অস্থিরতার সঙ্গে ঘরের বারান্দায় পায়চারী করছিল। এক সময় স্ত্রী সাবিত্রীকে লক্ষ্য করে বলল, “মোহিনী এখনও কিরে এলো না। তুমি বললে মন্দিরে গিয়েছে। কিন্তু মন্দিরে তো আমি গুকে দেখলাম না। গেল কোথায়?”

সাবিত্রী বলল, “কোথায়? রনবীরের সঙ্গে হয়ত বা ঝিলের কিনারায় খেলা করতে গেছে।”

“ঝিলের কিনারে ডুবে গেলে কেমন হবে?”

“তুমি ঘরে বসে বিড়বিড় করছ, অথচ একটু বাইরে গিয়ে দেখতেও তো পার।”

অর্জুন খর থেকে বের হ’তে যাচ্ছিল, এমন সময় মোহিনী ও রনবীর এসে ঘরে প্রবেশ করল। অর্জুন জিজ্ঞাস করল, “কোথায় ছিলে তোমরা?”



মোহিনী বলল, "ঝিলের কাছে গিয়েছিলাম, বাবা। বকের বাচ্চা দেখেছি। এই দেখ পদ্মফুল এনেছি। দেখ তো কত সুন্দর ফুল।"

অর্জুন বলল, "হায় ভগবান! ফুল তুলতে গিয়ে যদি জলে ডুবে মরতে, তাহলে কি হ'ত?"

"আমরা তো জলে নামিনি বাবা। একটি ছেলে আমাদের ফুল তুলে দিয়েছে, তার নাম মাধব। সবাইকে সে ফুল আর শালুক তুলে দিয়েছে। মাধব ভাল বশিও বঞ্জির, বাবা!"

"মাধব কে?"

"ঝিলের ওই পারে থাকে।"

"হায়! হায়! ওরা তো শূত্র। শূত্রের হাতের ফুল অপবিত্র। ফেলে দাও, ফেলে দাও।"

মোহিনী বলল, "না, বাবা। মাধব খুব সুন্দর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঝিল থেকে তাজা ফুল তুলে এনেই আমাদের হাতে দিয়েছে। ফুল কখনো অপবিত্র হয় না, বাবা।"

অর্জুন ফুলগুলো টান মেয়ে উঠানে গরুর সামনে ফেলে দিল। বলল, "দেখছ! শূত্রের হাতের ছোঁয়া ফুল গরুও খাচ্ছে না।"

রনবীর বলল, "কাকা বাবু! গরু তো পদ্মফুল খায় না।"

অর্জুন রাগ করে বলল, "হ্যাঁ, আমাকে দেখাতে হবে না। দু'জনই শূত্র ছেলের হাত থেকে ফুল আর শালুক নিয়ে এসেছে। ওসব ফেলে দিয়ে 'চান' করে তবে ঘরে যেও।"

সাবিত্রীকে ডেকে অর্জুন বলল, "তোমার মনে কি করে এসেছে দেখ। শূত্র ছেলের তোলা ফুল নিয়ে এসেছে। ওকে 'চান' করিয়ে পবিত্র করে নিও।"

রনবীর বলল, "কাকা বাবু! মাধবকে আমরা ভগবান দেখাবার জন্য মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিলাম। শংকর তার মাথা কাটিয়ে দিয়েছে। আমিও পাথর মেয়ে শংকরের মাথা ভেঙে দিয়েছি। বাবার কাছে বসে শংকরকে মন্দির থেকে বের করে দেব।"

অর্জুন বলল, "তোমরা অপবিত্র শূত্র ছেলেকে ভগবানের মন্দিরে নিয়ে গেলে কেন?"

"মন্দির দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

"শূত্র ছেলে মন্দিরে প্রবেশ করলে মন্দির অপবিত্র হয়ে যায় জানো না?"

মোহিনী প্রশ্ন করল, "কেন, বাবা? মাধব তো ঝিলের জলে গান করে পরিষ্কার হাত পা নিয়েই মন্দিরে গিয়েছিল। তবু মন্দির অপবিত্র হবে কেন?"

"পাগলী মেয়ে। শূত্র গান করার পরও অপবিত্রই থাকে। তারা ভগবানের মন্দিরে যেতে পারেনা।"

"কেন বাবা! ভগবান ওদের সৃষ্টি করেন নি?"

“করেছেন। কিছু তিনিই ওদের অপবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন।”

“তাদের হাত-পা, নাক, চোখ-মুখ সবই তো আমাদেরই মত। কোথাও তো অপবিত্র কিছুই দেখা যায় না।”

“বোকা মেয়েকে বুঝানো মুশকিল। ভগবান নিজেই ওদের সমগ্র শরীরটাই অপবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন।”

“তাহলে তো ভগবান খুবই খারাপ কাজ করেছেন বাবা! শংকরের মত বদ লোককে পবিত্র আর মাধবের মত ভাল ছেলেকে অপবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি এমন অন্যায় কেন করেন বাবা!”

“বোকা মেয়ে! ভগবান যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। ভগবানের কোন কাজই অন্যায় নয়। বাগানে দেখছ না, একটা গাছ বড়, আবার আশে পাশে একটা গাছ ছোট। কারো পায়ের রং ফর্সা আবার কেউ বা কালো। মানুষের মধ্যকার কেউ উঁচু জাতের, আবার অনেকে নীচু জাতের। এসব ভগবানের লীলা। তুমি তা বুঝবে না। যাও, ‘চান’ করে এসো। আমার মাথার মগজ আর চিবিয়ে খেয়োনা।”

রনবীর বলল, “আমি কিছু শংকরকে দেখে নেবো-কাকা বাবু।”

অর্জুন বলল, “দেখ রনবীর! তুমি নগরপতির ছেলো। সামান্য একটা শূত্র ছেলের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব মানায় না। আর কখনও তার সঙ্গে মেলামেশা করোনা, বুঝলে?”

রনবীর মাথা নীচু করে বাড়ীর দিকে হেঁটে যেতে চিন্তা করছিল, মাধব অপবিত্র হল কি করে? ভগবান মানুষকে দু'ভাবে সৃষ্টি করেন কেন? এক ভাগ পবিত্র আর অপরভাগ অপবিত্র। অথচ তাদের প্রকৃতি ও সৈহিক গঠনে কোন পার্থক্য নেই। কে পবিত্র আর কে অপবিত্র, তা বুঝবার উপায় কি? শংকরের মত নির্দয় মানুষ পবিত্র হল কি করে? যার অন্তরে একটি ছোট ছেলের প্রতি মোটেও দয়ামায়া নেই, সে তো নিজেই অপবিত্র। অথচ মাধব ও তার মায়ের আচরণ কত সুন্দর! তারা নাকি অপবিত্র। তার কিশোর মগজ এ সব প্রশ্নের কোনই সদুত্তর দিতে পারলো না। ভগবান, মন্দির, পুরোহিত, শংকর, কেশব এ সবই যেন তার কাছে এক দূর্বোধ্য বিষয় মনে হ'তে লাগল। মাধব ও শংকর ভগবানের অপরূপ সৃষ্টি। তাদের দৈহিক গঠন যেমন অতি চমৎকার, তেমনি তাদের কথাবার্তাও অতি মিষ্ট। মাধব এত সুন্দর সুরে বাশি বাজাতে পারে, ভজন গাইতে পারে। তার গলায় স্বরও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তবু মাধব কেন অপবিত্র হল? কে তাকে অপবিত্র ঘোষণা করল? বিনদুটে চেহারার শংকরই যে পবিত্র তারই বা প্রমাণ কি? রনবীর যতই চিন্তা করে ততই তার কাছে এসব হেয়ালী মনে হতে থাকে।

## বিশ

চারটি বছর কেটে গেল। এ সময়ের মধ্যে মোহিনী এবং রনবীর সময়ের পরিবেশ থেকে বুঝতে পেরেছে যে, পূর্ব জন্মে তারা যে সব সং কাজ করেছিল, তারই প্রতিফল স্বরূপ এ জন্মে উঁচু জাতে তাদের জন্ম হয়েছে। আর যারা পূর্বজন্মে গুণীপ করেছিল, তারাই এ জন্মে শূন্যরূপ ধারণ করে পাপ মোচন করছে।

মাধবও বুঝতে পেরেছে, সে শূন্য। উঁচু জাতের সঙ্গে মেলামেশা করার কোন অধিকার তার নেই। সে বস্ত্রিতে জন্মেছে। বস্ত্রির বাইরে শহর মাওয়া তার জন্ম নিষিদ্ধ। মাধব নিকটের একটি টিলার ওপর উঠে শহরের দৃশ্য দেখে কি সুন্দর আলো কলমল নগরী! আর বস্ত্রির মানুষ কি কষ্টে দিন কাটায়। রাত্রিবেলা অন্ধকারে হারিয়ে যায় ঘাসপাতার তৈরী ঘরগুলো। দূরে মন্দির দেখা যায়। ভগবানের মন্দির। ভক্তিতে তার মাথা নুয়ে আসে। ভগবানই এমন সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। নীল আকাশ, সবুজ ধরণী, কলকলগামী নদী, মনোরম পাহাড় সবই তার মহান সৃষ্টি। তিনিই তো মোহিনী ও রনবীরের মত সুন্দরন বালক বালিকা তৈরী করেছেন। মাধব তাদের ভুলতে পারে না। বিশেষ করে মোহিনীর মধুর চেহারাখনি স্বপ্নবার তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যদি সে শূন্যের ঘরে না জন্মাতো তাহলে তো অবশ্যই রনবীর ও মোহিনীর সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে পারতো। মাধব ভগবানের উদ্দেশ্যে মাথা নত করে বলে "ভগবান! তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছো। জেমার মহান সৃষ্টি কত সুন্দর। কত আনন্দময়। ভগবান, তুমি উচ্চ ও নীচের ভেদাভেদ দূর করে দাও। সকল মানুষই তোমার সৃষ্টি। তাদের সকলকে অবাধে মেলামেশা করার সুযোগ দাও। একমাত্র তুমিই আমাদের সকলকে সমান করে দিতে পারো।"

প্রতিদিন সে ঝিলের ওপর কিনারায় গিয়ে রনবীর ও মোহিনীর আশায় দাঁড়িয়ে থাকে। তার মত অন্ধুর ছেলেকে তারা ভুলে গেছে মনে করে আবার সে ফিরে যায়। তার মন বলে ওঠে "না, মোহিনী আমাকে ভুলতে পারে না।" কত যত্ন করে সে নিজের ওড়না দিয়ে সের্বিন মাথা বেঁধে দিয়েছিল। মায়া-মমতার এ দেবী কি করে ভুলে যেতে পারে!

একদিন মাধব ঝিলের কিনারায় পাছের ওপর বসে শহরের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। সহসা সে রনবীর ও মোহিনীকে আর কয়েকটি বালক বালিকার সঙ্গে ঝিলের দিকে

আসতে দেখল। মাধবের সমস্ত দেহ আনন্দে রোমাঙ্কিত হয়ে উঠল। ইচ্ছে হচ্ছে, দ্রুত গাছ থেকে নেমে গিয়ে আগলুকদের সে অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু পরক্ষণেই তার সবকিছু স্বরণ হল। সে গাছের ঘন পাতায় ঢাকা একটি শাখায় এমন ভাবে বসে রইল যেন সেখানে বসে সে মোহিনীকে দেখতে পায়। মোহিনী ও রনবীর দলবল সহ স্কিলের নিকটে এসে হৈ চৈ করে ফুলতোলা ও সীতার কাটায় মেতে উঠল। মোহিনী ঝিলে নামেনি। গাছের শাখায় একটি কোকিল 'কুহ' 'কুহ' করে ডাকছিল। মোহিনীও তার সুমধুর স্বরে কোকিলের সঙ্গে সঙ্গে "কুহ" "কুহ" করতে লাগল। এক সময় সে খোপের নিকট আসতেই কোকিলটি উড়ে গেল। এবার মোহিনী ফিরে যেতে উদ্যত হল। মাধব তখনই মধুর সুর লহরীতে বীণী বাজাতে শুরু করল। মোহিনী ফিরে দাঁড়াল। বীণীর সুর তাকে যাদুর মত টেনে গাছের নীচে নিয়ে এলো। মোহিনী গাছের নীচে দাঁড়িয়ে তনয় হয়ে বীণীর আওয়াজ শুনতে লাগল। আর মাধব মন প্রাণ দিয়ে বীণী বাজাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর বীণীর সুর বন্ধ হতেই মোহিনী বলে উঠল, "কে, মাধব নাকি?"

মাধব অতি দ্রুত গাছ থেকে নীচে নেমে এসে বলল, "হ্যাঁ, মোহিনী! তুমি এসেছ? আমি তোমার জন্য কতদিন থেকে পথের দিকে তাকিয়ে আছি! মনে করেছিলাম, আর হয়ত তোমার দেখাই পাব না।"

মোহিনী বলল, "আমি রনবীরকে নিয়ে সারাদিন কয়েকবার এখানে এসেছি। তোমাকেও খুঁজেছি। কিন্তু দেখা পাইনি।"

মাধব বলল, "আমি তো মনে করেছিলাম, তুমি হয়ত কোনদিনই আমাকে তালাশ করবেনা।"

"কেন, তুমি এমনটি ভেবেছিলে কেন?"

"তোমরা শহরের উঁচু জায়গায় থাক, আর আমি বস্তির পরীব ছেলে।"

"তাহলে কি হয়? তুমি গাছ উঠে বীণী বাজাতে পার। শহরে তো এমন সুন্দর করে কেউ বীণী বাজাতে পারে না।"

"বীণীর সুর তোমার ভাল লাগে মোহিনী?"

"হ্যাঁ, খুব ভাল লাগে।"

ওদের কথাবার মধ্যখানে রনবীর ঝিল থেকে উঠে ডাকতে শুরু করল, "মোহিনী! কোথায় তুমি?"

মোহিনী ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, "আমি যাই মাধব। রনবীর আমাকে ডাকছে। ওরা এখনই হারিয়ে যাবে।"

মাধব ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, "আর কোন দিন এদিকে আসবে না।?"

“তা তো বলতে পারি না,” বলতে বলতে মোহিনী নৌড় দিল।

রনবীর জিজ্ঞেস করল, “ও দিকে কোথায় গিয়েছিলে?”

মোহিনী বলল, একটি পাখী গান গাইছিল। আমি সেই পাখীটিকে দেখতে গিয়েছিলাম।

“চল, এবার বাড়ী যাই।”

“চল।”

তারার সকলে শহরের দিকে পা বাড়াল। মাথব গাছে উঠে এক দৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাবার পর মাথবের মস্তুর থেকে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বের হয়ে এলো। বিষণ্ণ মুখে গাছ থেকে নেমে ধীরে ধীরে সে বস্তির দিকে চলে গেল।

একুশ

মাথব নিজের হাতে কাঁদা দিয়ে ভগবানের মূর্তি তৈরী করে ঝোপের তিতর লুকিয়ে লুকিয়ে পূজা করে, ভজন গায় এবং ভগবানকে বাঁশী বাজিয়ে শোনায়। পরপর কয়েকটি মূর্তি পরিবর্তন করে সে সকলের শেষে যেটি তৈরী করল, সেটি দেখতে খুবই সুন্দর। ভগবানের কাছে সে শুধু একটি আবেদন বার বার পেশ করে, “হে ভগবান! তুমি সকল মানুষকে সমান করে দাও, শূদ্রদের দুরবস্থা থেকে উদ্ধার কর। মন্দিরে গিয়ে তারাও তোমার পূজা করবে এবং তোমার ভজন গাইতে চায়। তুমি তাদের সে অধিকার দাও।”

প্রায় বছর দুই পর একদিন রনবীর ও মোহিনী ঝিলের নিকট বেড়াতে এলো। সে সময় মাথব ঝোপের মধ্যে ভগবানের মূর্তির সামনে বসে বাঁশী বাজাচ্ছিল। রনবীর বলল, “কে যেন সুন্দর বাঁশী বাজাচ্ছে, তাই না?”

মোহিনী বলল, “তুমি ওকে চেন না?”

“না তো। কে ও?”

“মাথব।”

“মাথব? কোন মাথব?”

“তুমি ভুলে গেছ। যে ছেলটিকে আমরা ভগবানের মন্দির দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। শংকর যাকে মেরেছিল।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেই শূদ্র ছেলটো।”

শূদ্র কথাটি শুনে মোহিনী কিছুটা দমে গেল। তদিকে মাধব বীশী বাজানো বন্ধ করে ভজন গাইতে শুরু করল। তার গলার মিষ্টি সুরে মুগ্ধ হয়ে পুনরায় রনবীর বলল, “ভজন গাইছে কে? সেই নাকি?”

মোহিনী বলল, “বোধ হয় সেই।”

রনবীর বলল, “শূদ্র ছেলে তো এমনভাবে ভজন গাইতে পারে না! চক্ক তো, দেখে আসি।”

মোহিনী ও রনবীর কোম্পের ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পেল, একটি উঁচু বেদীর উপর একটি মূর্তি রাখা হয়েছে। চারদিকে ভাঙ্গা ফুল দিয়ে বেলাটি সাজানো। তার সামনে বসে মাধব তনুর হয়ে ভজন গাইছে। মোহিনী ও রনবীরের পায়ের শব্দে চমকে উঠে মাধব সঙ্গীত থামিয়ে পেছনে ফিরে দুজনকে দেখে বসীতে ভগমগ হয়ে উঠল। বলল, “তোমরা এসেছ? আমার পূজা তাহলে বৃথা ফরানি। ভগবান তোমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি প্রতিদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাদের এখানে পাঠিয়েদেন।”

রনবীর বলল, “তোমার সঙ্গীত শুনেই এলাম। তুমি খুব ভাল পাইতে পার দেখছি।”

“আমার গান তোমাদের পছন্দ হয়?”

মোহিনী বলল, “খুবই পছন্দ হয়, রনবীর বলছিল, আমাদের শহরেও তো এমন সুন্দর করে কেউ গাইতে পারে না।”

রনবীর জিজ্ঞেস করল, “তুমি মাধব, তাই না?”

“হ্যাঁ, তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ, দেখছি।”

“তুমি ভজন কোথায় শিখেছ?”

“তোমরাই তো আমাকে শিখিয়েছিলে।”

“কবে, কোথায়?”

“মনে নেই? ভগবানের মন্দিরে আমাকে যেদিন নিয়ে গিয়েছিলে, সেদিন।”

রনবীরের বহু কথা শ্রবণ হল। সে বলল, “হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কিন্তু সে তো অনেক দিন হল। তুমি এখনও তা মনে রেখেছ?”

“আমি তো প্রতিদিন ভগবানের সামনে এই গান গেয়ে থাকি। তাই আমি তার একটি বর্ণও ভুলিনি।”

রনবীর জিজ্ঞেস করল, “ভগবানের মূর্তি পেলে কোথায়?”

“আমি নিজের হাতে তৈরী করে নিয়েছি। এটা খুব ছোট। একটি বড় ভগবান তৈরী করব। সেটা দেখতে তোমরা আসবে?”

রনবীর ও মোহিনী কোন জবাব দিল না। মাধব বলল, “অবশ্যই এসো। আমি তো রোজ রাতে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে তোমাদের সুন্দর শহরটির দিকে তাকিয়ে থাকি। কাল তো সারা রাত শহরে আলো কলমল করছিল।”

মোহিনী বলল, “কাল যে আমাদের দীপালি উৎসব ছিল।”

“দীপালি কি?”

“ঐ তারিখে রামচন্দ্র রাবনের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়ে শহরে ফিরে এসেছিলেন। তার আগমন উপলক্ষে শহরের লোকেরা সারা রাত আলো জ্বালিয়ে আনন্দ উৎসব করে। সেটাই দীপালি উৎসব।”

“রামচন্দ্র কে?”

“তিনি ভগবানের অবতার।”

“অবতার কি?”

“অবতার মানুষই, তবে তার মধ্যে ভগবানের মতই শক্তি থাকে।”

“কি করে এ শক্তি আসে?”

“ভগবানের পূজা করে।”

“তাহলে আমিও ভগবানের পূজা করব। কিন্তু মা বলেন, শত পূজা করেও নাকি শূত্র তোমাদের সমান হতে পারে না।”

মোহিনী নীরবে রনবীরের চোখের দিকে তাকাল। সে যেন রনবীরকে চোখে চোখে বলতে চাইছে, “মাধবকে এ বিষয়ে কিছু বুঝিয়ে বল।”

মাধব অস্থির হয়ে বলল, “ভগবানের দোহাই! তোমরা বল, আমি কি সারা জীবনই শূত্র থাকব?”

মোহিনী বলল, “না, না, ভগবান অবশ্যই তোমার প্রতি দয়া করবেন।”

রনবীর বলল, “আমি ভগবানের এ মূর্তিটি ভূমি সর্বদা লুকিয়ে রেখো। কেউ যেন দেখতে না পারে। আর তোমার ভজন সংগীত খুব সাবধানে গাইবে। যদি কেউ শুনে, তাহলে তোমার জীবন বিপন্ন হবে।”

মাধব বলল, “মূর্তি তো আমি সর্বদাই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখি। কিন্তু ভজন সংগীত খোঁসিঃশদে গাওয়া যায় না।”

“আমি তোমাকে বলে দিছি। অন্য কেউ শুনে পেলে তোমার উপর অত্যাচার

করবে। চল মোহিনী, আমরা চলে যাই।”

রনবীর যেতে উদ্যত হল। মাধব মূর্তিটি ঝোপের ভিতর লুকিয়ে রেখে বনের বাইরে আসতেই শান্তা ‘দাদা’ বলে ডাক দিল।

মাধব বলল, “এসো শান্তা।”

শান্তা বলল, “কখন থেকে তোমাকে আমি খুঁজে বেড়াছি!”

রনবীর যেতে উদ্যত হয়েও শান্তাকে দেখে ফিরে দাঁড়াল। এমন সুন্দর মুখ ও নিখুঁত গড়ন শহরের বাসিন্দাদের মধ্যেও কদাচিৎ দেখা যায়। মাধবকে জিজ্ঞেস করল, “শান্তা কি তোমার বোন?”

মাধব বলল, “হ্যাঁ, আমার বোন।”

রনবীর বলল, “আচ্ছা আজ যাই। আবার আসব।”

শান্তা বলল, “ওরা কে, দাদা?”

“ভগ্না ভগবানের অবতার।”

শান্তা কিছুই বলল না। মাধব জিজ্ঞেস করল, “অবতার কি? কিছু বুঝতে পারলে?”

শান্তা বলল, “তুমি মনে কর আমি কিছুই বুঝি না। শহরের লোকদেরই অবতার বলে, তাই না?”

মাধব হেসে বলল, “দূর পাগলী। তুই যা বুঝিস তা-ই।”

বাড়ীর পথে হাঁটতে হাঁটতে মোহিনী রনবীরকে বলল, “কি ভাবছ রনুদা?”

রনবীর জবাব দিল, “মাধব আর শান্তার কথা ভাবছি। ভগ্নবান ওদের এতো সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। উঁচু জাতের শহরে লোকদের মধ্যে এমন মানুষ দেখা যায় না। অথচ তিনিই তাদের শূত্রের মতো জন্ম দিয়ে সকলের ঘৃণার পাত্র করে দিয়েছেন। তারি কী অদ্ভুত খেলা!”

মোহিনী বলল, “আমরা কিছু ভসব বিশ্বাস হয় না রনুদা। ভগ্নবান এমন নির্দয় হ’তে পারেন না। যা যেমন তার সকল সন্তানকে সমান প্রেহ করেন, তেমনি ভগ্নবানও নিশ্চয় সব মানুষকে সমান ভালবাসেন।”

“তাহলে, তোমার কি মনে হয়, ভগ্নবান শূত্রদেরও ভালবাসেন?”

“নিশ্চয়ই! কেন বাসবেন না? তিনি যে সকলেরই ভগ্নবান!”

“তবে তারা ছোট জাত হল কী করে?”

“আমরা বিশ্বাস, ভগ্নবান ওদের ছোট করে সৃষ্টি করেননি। ওদের হাত-পা সব কিছুই উঁচু জাতের লোকদেরই মত। কোথাও খুঁ নেই। ভগ্নবান তাদের নাক-চোখের



কোনটাই কম দেননি। শংকরের মত হিংসুটে মানুষেরাই শুদের ছোট জাত বানিয়ে গেছে।”

রনবীর বলল, “হতেও পারে। বিষয়টি সম্পর্কে ভেবে দেখতে হবে।”

## বাইশ

রাত্রিতে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে মাধব ঘর থেকে অতি সাবধানে বের হয়ে এলো। শহরের মন্দির থেকে ঘন্টার আওয়াজ হাওয়ায় ভেসে এল মাধবকে ঘেন যাদু বলে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে। অতি সাবধানে চলতে চলতে সে মন্দিরের নিকটে পৌঁছে চারদিক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে পুনরায় এগিয়ে গেল। মন্দিরের একপাশে একটি বড় আমগাছ। মাধব অন্ধকারে আমগাছের ডলায় দাড়িয়ে কান পেতে শুনল, মন্দিরে ভজন গাওয়া হচ্ছে। সংগীত শেখা বাজাইত বিনায় হলো। গোপাল, শংকর এবং অনৈক আচার্য নমস্কার করে পুরোহিতকে বিদায়ী সম্বাষণ জানালো। পুরোহিত চলে যাবার পর আচার্য, গোপাল আর শংকর মন্দির প্রাঙ্গণে তিনটি খাটিয়ায় শুয়ে গর জুড়েপিল।

শংকর আচার্যকে জিজ্ঞেস করল, “আপনি কতগুলো দেব-দেবীর মূর্তি তৈরী করেছেন।”

“প্রায়দুশো।”

“কালী মূর্তি গড়তে পারেন?”

“রামনগরের কালী মূর্তি তো আমিই তৈরী করেছিলাম। তাই দেখে, মহারাজা খুশী হয়ে আমাকে একটি হাতী উপহার দিয়েছিলেন।”

“হাতী দিয়ে আপনি কি করেন?”

“কি আর করব? হাতীটা আমার জন্য এক বিপদ হয়ে দাঁড়াল। তাই আমি শুটা মন্দিরের পুরোহিতকে দান করে দিয়েছি।”

গোপাল বলল, “রামনগরের কালী মূর্তি তো বিখ্যাত। তুনেছি সেখানে নাকি নরবলি হয়?”

“হ্যাঁ হয়, তবে শুধুমাত্র শুদের ধরে নিয়ে কালী মন্দিরে বলিদান করা হয়। কোন

তুঁ জ্ঞাতের মানুষকে বলি দেয়া হয় না।”

“এখানেও হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের নগরপতি এটার বোর বিরোধিতা করেন। আর এ জন্যই এখানে শূদ্রদের খুব প্রতাপ। রাস্তায় দেখা হলে এরা কিছুতেই পথ ছেড়ে দেয় না। অগত্যা আপনাকেই পথ ছেড়ে দিতে হবে।”

শংকর বলল, “না, না, তা নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, নীচ জাতের মানুষ লোকদের সঙ্গে কড়াকড়ি ব্যবহার করার কালে এরা দূর জংগলে পালিয়ে থেকে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতো। কিন্তু আমাদের নতুন নগরপতি রামদাস ভদ্রের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার ফলে ওরা এখন লড়াই-কগড়া ছেড়ে দিয়ে বুক হয়ে বসবাস করছে। শত্রুকে চটিয়ে দেয়ার পরিবর্ত তাকে কৌশলে বশ করে নেয়াই তো উত্তম। রামদাসের এ নীতি খুব সফল হয়েছে। শূদ্ররা বুকতেই পারছে না, আমরা কি কৌশলে ওদের দিয়ে আমাদের গোলামী করানছি। মহারাজা তাই রামদাসের কৌশল পছন্দ করেন।”

গম করতে করতে তিনজনই ঘুমিয়ে পড়ল। মাথব তাদের দারুণ ডাকার শব্দ শুনে পেল। দুই পূজারী ও এক আচার্যের আলোচনা থেকে মাথব পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারল যে, ভগবান তাদের শূদ্ররূপে সৃষ্টি করেন নি। বরং তুঁ জ্ঞাতের সমাজপতিরাই চালাকি করে মানুষকে শূদ্র আখ্যা দিয়ে সমাজের ভেতর বানিয়ে নিয়েছে। মাথব পা টিপে টিপে মন্দিরে প্রবেশ করল। তারপর ভগবানের মূর্তির সামনে দাড়িয়ে আবেদন করল, “ভগবান! তুমি সকলেরই স্রষ্টা। তোমার ব্রহ্ম-সৃষ্টি, আলো-বাতাস নিরপেক্ষভাবে সকলেরই উপকার করে। তোমার এ দয়ার সত্যতা প্রকাশ করার ভাষা আমরা জানি না। ব্রাহ্মণেরা তোমার মন্দির আমাদের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। আমি তোমার পূজা করতেই থাকব। তুমি আমাকে সাহায্য করে। আমি তোমার মূর্তি গড়বো। তুমি আমাকে নিষ্ঠুর সমাজপতিদের আক্রমণ থেকে রক্ষা কর।”

বলতে বলতে মাথব মাথা নত করে ভগবানকে প্রণাম করল। তারপর আরও নিকটে গিয়ে মূর্তির গায়ে হাত বুড়িয়ে তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ সম্পর্কে মনে মনে একটা মাপ ঠিক করে নিলো। মন্দির থেকে বের হবার পথে একটি কাঠের ঝাঞ্জে আচার্য ঠাকুরের মূর্তি তৈরী করার যন্ত্রপাতি দেখতে পেয়ে, চট করে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। সে নুয়ে বাস থেকে দু’তিনটি জিনিস বেছে নিয়ে পা টিপে টিপে পুনরায় মন্দির থেকে বের হয়ে গোটা পূজারী দু’জন এবং আচার্য তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

অর্জুন বাড়ীতে এসে বলল, "কি আচার্য ব্যাপার। ভগবানের মন্দির থেকে চুরি হল?"

মোহিনী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি চুরি হয়েছে বাবা?"

অর্জুন বলল, "কি বলব বাছা, কালী মূর্তি তৈরী করার জন্য একদিন আচার্য এসেছে। তার মূর্তি তৈরীর ব্যয় থেকে কিছু ফ্রপাতি খোয়া গেছে।"

"কখন চুরি হল, বাবা?"

"কালরাতে।"

"তারপর?"

"সকালে আচার্য হৈ চৈ শুরু করল। সে মন্দিরের দু'জন পূজারী শংকর আর গোপালকে সন্দেহ করছে। কারণ ঐ রাত্রিতে শংকর, গোপাল আর আচার্য ছাড়া মন্দিরে নাকি কেউ আসেনি। গোপাল বলল, আচার্য অনেক সময় মিছে কথা বলে। সে নাকি দাবী করে যে, রামনগরের কালী মূর্তিটি তার হাতের তৈরী। অথচ সেটি কয়েক শত বছরের পুরাতন মূর্তি। তাই নগরপতি রায়লাল তাকে তিনটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে বিদায় করে দিয়েছেন। শংকর আর গোপালকেও অসন্তর্ক অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকার ব্যাপারে সন্তর্ক করে দিয়েছেন।"

"কিন্তু আচার্যের এসব ফ্রপাতি কে চুরি করতে পারে?"

"এসব নিশ্চয়ই কোন শূত্রের কাজ।"

"তাহলে এখন কি হবে?"

"বুজে দেখব, কে একাজ করেছে। যে ধরা পড়বে তাকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। শূত্র হয়ে মন্দিরের ভিতরে যাওয়া, তার উপর আচার্যের ফ্রপাতি চুরি করা, এসব তো ঘোরতর অপরাধ, মা!"

মোহিনী দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার হয়ে উঠল। সে মনে মনে ভাবতে লাগল, এটা নিশ্চয়ই মাধবের কাজ। মন্দিরই একদিন বলেছিল, সে ভগবানের পূজা করে অবতার হবে। মোহিনী তাকেই মাটি দিয়ে ভগবানের মূর্তি তৈরী করতে দেখেছে। যদি মাধব ধরা পড়ে যায়, জাঙ্কল সমাজের নেতারা তাকে নিষ্ঠুর ভাবে শাস্তি দেবে। আর মাধবের শাস্তি হচ্ছে তার প্রাণে বড়ই বাজবে। দিন গিয়ে রাত্রি এলো। মোহিনী শুয়ে শুয়ে কেবল মাধবের চিন্তাই করল। এক সময় চিন্তিত মনে সে ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্নে দেখতে পেল, শংকর ও গোপাল মাধবকে মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে এনেছে। সঙ্গে চুরি করা জিনিসগুলিও রয়েছে। আর রয়েছে পাথর কেটে মাধবের তৈরী করা একটি অসম্পূর্ণ

দেবমূর্তি। মন্দিরে বহু লোক জমায়েত হয়েছে। তাদের সকলেরই চোখে মুখে ক্রোধের চিহ্ন। মাধবের মা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কানিছে আর চীৎকার করে বলছে, "আমার বাছাকে তোমরা ছেড়ে দাও। তোমাদের পায়ে ধরি। দুঃখিনীর প্রতি তোমরা দয়া কর।"

কিছু দয়া করতে কেউ রাজী নয়। সকলেই পুরুত ঠাকুরের আগমন প্রতীক্ষা করছে। এক সময় পুরুত ঠাকুর এলেন এবং মাধবকে মন্দিরে বলি দেওয়ার হুকুম দিলেন।

মোহিনী দেখতে পেল, শংকর মাধবকে ধরে নিয়ে মন্দিরে বেদীর সামনে হাটু পেড়ে বসিয়ে দিল। উলঙ্গ খড়্গ হাতে নিয়ে গোপাল বিভ্রিভি করে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। তারপর এক সময় খড়্গটি টিক্ টিক্ করে শূন্য উঠে গেল এবং পর মুহূর্তেই তা মাধবের ঘাড়ে নেমে এসে দেহটিকে বিচ্ছিন্ন করে দিল।

মোহিনী ভয়ে চীৎকার করে উঠল। সাবিত্রী তাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে মোহিনী?"

মোহিনী উঠে বসল। চোখ রণভেদে কাঁপতে কাঁপতে চারদিকে তাকিয়ে যেন খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সে বুঝতে পারল, এটা একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র।

সাবিত্রী বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল, "কি হয়েছে মা! তুই অমন করছিস কেন?"

মোহিনী বলল, "কিছু হয়নি মা। আমি একটা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখলাম। এখন আর তা শরণ করতে পারছি না।"

কিছুক্ষণ পর মা ও মেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে রনবীর এসে বলল, "চল, মোহিনী মন্দিরে যাই।"

সাবিত্রী বলল, "একটু অপেক্ষা কর রনবীর। আমি দুধ দুইয়ে গরম করে নিষি। দুধ খেয়ে মন্দিরে যোগ।" সাবিত্রী লক্ষণা বলে গাই দুইতে চলে গেল।

মোহিনী বলল, "রনবীর একটা কাজ করে আসবে?"

"কি কাজ বলে।"

"মন্দির থেকে অর্চনার যন্ত্রপাতি চুরির খবর নিশ্চয় শুনেছ। আমার বিশ্বাস, একাজ মাধব ছাড়া আর কেউ করেনি। তুমি তাকে মাটি দিয়ে দেব-মূর্তি তৈরী করতে দেখেছ। সে ভগবানের পূজা করে অবতার হতে চায়, তাও তুমি জান।"

"হ্যাঁ জানি সত্যি, কিন্তু তার আমি কি করতে পারি?"

"রনবীর তুমি তাকে নিয়ে সতর্ক করে নিয়ে এসো। যদি সে চুরি করে থাকে, তাহলে তাকে অনতিবিলম্বে হাতিয়ারগুলো ঝিলের জলে ফেলে দিতে বোলো। নাহলে ধরা পড়লে তার কঠোর শাস্তি হবে।"

রনবীর চিন্তিত হয়ে উঠল। বলল, “আচ্ছা, তুমি খেয়ে নাও। আমি মাধবকে দেখে আসছি।”

ঘোড়ায় চড়ে অরক্ষণের মধ্যে রনবীর খিলের পারে পৌঁছল। মাধবকে কোথাও দেখা গেল না। তবে শান্তাকে একটি ঝোপের নিকট দাড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। রনবীর ঘোড়া থেকে নেমে শান্তার নিকটে উপস্থিত হল। শান্তা তাকে দেখে খুব খুশী হয়ে উঠল। রনবীর বলল, “মাধব কোথায় শান্তা?”

শান্তা দুইহিমির হাসি হেসে বলল, “আমি তার কি জানি?”

শান্তার চোখেমুখে আনন্দের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখে রনবীরের ইচ্ছা হ'ল একবার সে তার মাথার চুল টেনে দেয়। কিন্তু সে যে শূন্য বালিকা, একথা স্বরণ হতেই রনবীর কিছুটা দমে গিয়ে বলল, “এখন দুইমী করোনা, শান্তা। আমি একটা খুব অরুচী খবর নিয়ে এসেছি। মাধবকে এখনই তা বলা দরকার। তা না হলে তার খুব বিপদ হবে।”

শান্তা বলল, “কি করে বলি। আমাকে যে সে বলতে মানস করছে।”

রনবীর বলল, “সে আমার কাছে বলতে নিশ্চয়ই মানস করেনি। শীর্ণবীর বলে ফ্যাল। আমাকে এখন আবার ফিরে যেতে হবে।”

অপত্যা শান্তা তাকে ঝোপের অপর দিকে খুঁজে গিয়ে একটি সংকীর্ণ অঙ্গলময় পথে নিয়ে চলল। ঝোপের ভিতরে গিয়ে সে অবতীর্ণ হয়ে বলল, “আরে, দাদা তো নেই। এছাড়া এখানে ছিল। দাদা! তুমি কোথায়?”

মাধব একটি গাছের ডালে বসে বিশ্রাম করে হেসে উঠল। রনবীর তাকে দেখে বলল, “নীচে নেমে এস। তোমার সারথীর কথা আছে।”

মাধব নীচে নেমে এলে রনবীর তাকে বলল, “কাল রাতে মন্দির থেকে মূর্তি তৈরী করার, যন্ত্রপাতি চুরি হয়েছে। যদি তুমি নিয়ে থাক, তাহলে তাড়াতাড়ি সেগুলো সরিয়ে ফেল। অন্যথায় খরা পড়ে গেলে তোমার ভীষণ দুর্গতি হবে।”

মাধব বলল, “সে বিষয় আমাকে আর বলতে হবে না। আমি মন্দিরের পূজারীদের ভাল করেই জানি।”

রনবীর বলল, “তুমি আমাকে সতর্ক করে দেয়ার জন্য মোহিনী আমাকে বারবার তাকিদ করে পাঠিয়েছে।”

“মোহিনী ও তুমি দু'জনই খুব ভাল মানুষ। তোমাদের দেখে তো ওই সমাজের মানুষের মত ভয় হয় না। আমার ভগবান দেখে যাবে না?”

বলেই সে লতাপাতা সরিয়ে পাথর কেটে তৈরী একটি মূর্তি বের করে নিয়ে এলো। রনবীর অবাক হয়ে দেখল, মূর্তিটি অত্যন্ত সুন্দর। তবে এখনও তৈরী সম্পূর্ণ হয়নি। রনবীর বলল, “আমি যাচ্ছি মাধব। তুমি ঐ মূর্তিটিও লুকিয়ে রেখো। যদি কেউ জানতে

পারে, তুমি দেবতার মূর্তি তৈরী করেছ, তাহলে কিছু এখানে হৈ চৈ বেঁধে যাবে।” শাস্তার দিকে তাকিয়ে রনবীর বলল, “শাস্তা! তুমি কখনও এ ব্যাপারে কারো সঙ্গে কিছু বলো না, বুঝলে?”

শাস্তা মাথা দু'লিয়ে সম্মতি জানাল। রনবীর পুনরায় ঘোড়ায় চড়ে শহরের দিকে রওনা হয়ে গেল। মাধব ঘোপের তিতর গিয়ে আবার পাথর কেটে মূর্তি তৈরী করার কাজে লেগে গেল। আর শাস্তা পুনরায় ঘোপের বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগল।

## চব্বিশ

প্রায় চার মাস কাল যাবৎ মাধবের তৎপরতা সম্পর্কে কমল ও পটু কিছুই টের পায়নি। সে খেলাধুলার বাহনায় ঝিলের দিকে বের হয়ে যায় এবং প্রায় সারাদিন সেখানেই থাকে। পটু সংসারের সকল কাজ পরিচালনা করে। বস্তির লোকদের নিকট সে এখন খুবই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হয়ে উঠেছে। শিকারে যাবার সময় তারা পটুকে সঙ্গে নিয়ে যায়। পটু প্রধানতঃ মাছ ধরা, মনে পশু শিকার এবং ভেড়া চরানোর কাজেই ব্যস্ত থাকে। পশু শিকারের উদ্দেশ্যে দূরে গেলে মাধবকে ভেড়া চরানোর দায়িত্ব দিয়ে যায়। মাধব নিত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভেড়া চরাতে যায়। পটুর ইচ্ছা মাধব মাছ ধরা ও পশু শিকারে দক্ষ হয়ে উঠুক। কারণ, তার বিবেচনায় যুবকদের উত্তম গুণ হচ্ছে, এ দু'বিদ্যায় নিপুণতা অর্জন। মাধব নিজে তেমন আগ্রহ দেখায় না বলে পটু তাকে চাপ দেয় না। তবে মাধবকে এসব বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার আকাংখাও তার মনে জাগে। একদিন সে কমলকে জিজ্ঞেস করল, “দিদি! মাধব সারাদিন বাড়ীতে বসে বসে কি করে?”

কমল বলল, “বাড়ীতে সে থাকে কই? বাড়ীতে তো সে মোটেই থাকে না। সারাদিনই ঝিলের জলে পাশে ঘুরাফিরা করে। শাস্তাও মাঝে মাঝে গুর সঙ্গে যায়।”

পটু শাস্তাকে জিজ্ঞেস করলে সেও বলল, “ঝিলের জলে রাজহাসি সাতার কাটে। আমরা তাদের সাতার কাটা দেখি।”

ওদের কথার মাঝখানে মাধব ঘরে প্রবেশ করল। পটু মাধবকেও একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। মাধব বলল, আমি ঝিলের জলে পদ্মফুল দেখি। আশে পাশের ঝোপঝাড় গুলোতে প্রাণীর বাসা তালাশ করি।

শান্তা ও মাধবের কথার গরমিল হল। পাঁচু বুঝতে পারল যে, তারা কিছু একটা গোপন করছে। তাই সে এ বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করল না।

খানিক পরেই মাধব ঝিলের দিকে বের হয়ে গেল। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ে সে মূর্তি তৈরী করার কাজে মনোনিবেশ করল। পাথর ছোট্টে মসুন করার জন্য এত পতীর মনোযোগ দিল যে, পুরোপুরি এ কাজেই সে ছুটি গেল। হঠাৎ পাঁচুও সেখানে গিয়ে হাজির হল। মাধব পাঁচুকে অতর্কিত উপস্থিত হয়ে দেখে একেবারে হকচকিয়ে উঠল। পাঁচু মাধবের সামনে পাথরের তৈরী দেবতার মূর্তি দেখে বিষয়ে হতবাক হয়ে গেল। মাধব বলল, “কাকা! এটা ভগবানের মূর্তি। আমিই এটা তৈরী করেছি।”

পাঁচু কোন কথা বলল না। চোখে তার আগুন জ্বলতে লাগল।

মাধব বলল, “আমি এটা তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাইনি। ইচ্ছা ছিল, মূর্তিটি তৈরী সম্পূর্ণ হলে তোমাকে দেখাব। কাকা! তুমি কেন এতটা দুঃখিত হয়েছে?”

পাঁচু কিছুই বলল না। শুধু ধীর পায়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে বাইশাটি হাতে তুলে নিল, তারপর মূর্তিটিকে ভেসে ফেলতে উদ্যত হচ্ছিল। মাধব বাইশাটি ছিনিয়ে নিয়ে পাঁচুকে টেনে মূর্তির নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দিল। পাঁচু আজ প্রথম বারের মত অনুভব করল যে, সে বুড়ো হয়ে পড়েছে। তার দেহের শক্তি এখন কমে যাচ্ছে। আর অপর দিকে মাধব নবযৌবনের শক্তিতে তার চাইতে অনেক বলশালী হয়ে উঠেছে। পরাক্রান্ত পাঁচু একবার মূর্তি, আরেকবার মাধবের পাথরের বাইশাটির দিকে তাকাল। মনে হল, উভয়েই যেন তার বার্ষিকের প্রতি উপভোগ করছে। অথচ তার সামনে যে যুবকটি দাঁড়িয়ে আছে, দেখে রয়েছে তার যুবকত্বের রক্ত এবং চেহারা তারই পৌরুষ। অসহায় পাঁচুর দুঃখ বেয়ে অশ্রু পড়িয়ে পড়ল। মাধব পাঁচুর আক্রমণ থেকে তার মূর্তিকে রক্ষা করল বটে কিন্তু তার চোখে অশ্রু বন্যা দেখে নিজেই আর সামলে রাখতে পারল না। অস্থির হয়ে সে পাঁচুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বলল, “কাকা! আমাকে ক্ষমা কর। আমার ভীষণ দুঃখ হয়ে গেছে। কাকা! আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।”

পাঁচু কয়েক মুহূর্ত জ্বালাত বে রাজত্ব হারিয়েছিল, তা কিরে পাওয়ার অনুভূতিতে খুশী হয়ে উঠল। সে মাধবের হাত ধরে উঠিয়ে তাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বলল, “বাবা! তুমি ছোট বেলার আমার গালে ঠাসু করে চড় মারতে আর আমি তার বিনিময়ে তোমার নরম তুলতুলে হাত জড়িতে চুমো যেতাম। আজও তুমি আমার কাছে তেমনই আছে।”

মাধব বলল, “কাকা! আমি ভগবানের মূর্তি তৈরী করেছি। কোন খারাপ কাজ তো করিনি। তুমি এসবুট হলে কেন, কাকা?”

পাঁচু বলল, “মাধব! রামুও এ ভাবে ভগবানের মূর্তি তৈরী করেছিল। সে জনসাঁধারণকে মাটির পুতুল দেখিয়ে ধোকা দিতে চেয়েছিল। তার অন্তরে ছিল মানুষকে দাস বানানোর আকাংখা। তোমার বাবা তার কুমতলবে সহযোগিতা না করার দরুন

প্রাণ দিয়েছেন। আর সেই মূর্তি আবার ভূমি তৈরী করতে লেগেছে?"

মাধব বলল, "কাকা! আমার ভগবান হিসেবে নয়। আমি এমন এক ভগবানের মূর্তি তৈরী করছি, যার চেখে সকল মানুষই সমান। আমার ভগবানের আলো বাতাস, রৌদ্র ও বৃষ্টি সকলেরই ভোগ করার অধিকার রয়েছে। তিনি দয়ার সাগর। সকলের দুঃখই তিনি গ্রহণ করেন। সকলেরই প্রয়োজন পূরণ করেন। কারো প্রতি তার কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব নেই।"

"কিন্তু তোমার নিজের হাতের তৈরী এক পাথরের টুকরার মধ্যে এ সব ভগ্ন কোথা থেকে আসবে?"

"কাকা! এটা ভগবান নয়। ভগবানের মূর্তি মাত্র। সামনে কিছু একটা রেখে আসল ভগবানের পূজা করাই আমার উদ্দেশ্য।"

"সেজন্য মূর্তি তৈরী করার কি প্রয়োজন? তার সৃষ্ট চন্দ্রসুখী, শাহপালা, পশুপক্ষী, নদীপাহাড়, আলোবাতাস, সবুজ ঘাস, ফলফুল, খাদ্য সমস্তই প্রত্যেকটি তো সেই ভগবানের মহিমা ঘোষণা করছে। ভূমি তাদের দেখেই তো ভগবানকে যরণ করতে পার। তার তরল গাইতে পার। তার কাছে যা চাইবার চাইতে পার। তিনি সব শুনে, সব দেখেন ও সকলেরই প্রয়োজন পূরণ করেন। একটি ক্ষুদ্র পাথরের মূর্তিতে তাকে আবদ্ধ করতে চাও কেন?"

পছির এ বক্তৃতায় মাধবের জোখ খুলে গেল। সে যেন হঠাৎ এক মহাসত্যের সন্ধান পেল। বলল, "কাকা! আমি তোমার কথা বুঝতে পেরেছি। অবোধ হলে মানুষ আমি। আমাকে মাফ কর। ভূমি এ মূর্তিটি এখন নিজের হাতেই ভেঙ্গে ফেল।"

"না, না, ভূমি নিশ্চয়ই অনেক পরিচয় করে এটা তৈরী করেছে। এটা ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন নেই। ঝিলের জলে ফেলে দিয়েই চলবে।"

"তাহলে কাকা! আমি আজ রাতেই এটাকে ফেলে দেবো। দিনের বেলায় কেউ হয়ত দেখে ফেলতে পারে।"

কথাবার্তা বলার পর মূর্তিকে লতাপাতার নীচে লুকিয়ে রেখে দু'জনেই বাড়ীর দিকে চলল। পথে মাধব বলল, "কাকা! ভূমি ভগবান সম্পর্কে এত জ্ঞান কোথায় পেলে?"

পছির বলল, "মাধব! আমি নেহায়েত বোকা ছিলাম। সুখদেব আমার উপর একটা বিরাট ছায়া বিস্তার করে রেখেছিলেন। তার জীবদ্দশায় আমার কোন বিষয়ে চিন্তা করার কোনই দরকার ছিল না। সকল বিষয়ে তিনিই আমাকে পথ দেখাতেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তোমার ও শাস্ত্রের দারিদ্র আমার মত নির্বোধের কাছে এসে পড়ে। তাই তোমার জ্ঞানই আমাকে অনেক কিছু শিখতে হয়েছে। অনেক কিছু জানতে ও বুঝতে হয়েছে।"



সকাল বেলা নিজেস্ব কামরা থেকে বের হয়ে শংকর মন্দিরের পিছনে অতি সুন্দর একটি দেবমূর্তি দেখে চমকে উঠল। গোপাল তখনও ঘুমিয়ে ছিল। তাই এ সুখবরটি সকলের আগে নগরপতির নিকট পৌঁছানোর জন্য সে দৌড়াতে শুরু করল। এভাবে দৌড়াতে দেখে শহরের লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, "কি হয়েছে, শংকর ঠাকুর? এত ব্যস্ত হয়ে দৌড়াচ্ছ কেন?" কিন্তু শংকরের মৌখিকই ফুরানও নেই। তার আশংকা, গোপাল জেগে উঠে দেবমূর্তিটি দেখতে গেলে নগরপতির নিকট ছুটে যাবে এবং নগরপতি তাকেই সেজন্য পুরস্কার দিয়ে ফেলবে। সে কারুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আরও দ্রুত দৌড়াতে শুরু করল। অবস্থা দেখে একজন পথিকও তার পেছনে পেছনে ছুটে ছুটে তাকে জিজ্ঞেস করল, "শুধুর কি হয়েছে বলই না।"

কিছু দূর যাবার পর সে রনবীরকে দেখতে পেল। রনবীর তাকে ধামাঝামা চেষ্টা করলে শংকর পাশ কাটিয়ে চলে গেল। রনবীর ছুটে গিয়ে তার সবল হাতে শংকরকে শক্ত করে ধরে ফেলল। বলল, "কি ব্যাপার! ভূমি চুরি-চুরি করে পালানো নাকি? তোমার পেছনে এত লোক ছুটে আসছে কেন?"

শংকর বলল, "দোহাই ভগবানের! আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমার বাবার নিকট যাচ্ছি। সেখানে গিয়েই সব কথা বলব।"

রনবীর বলল, "আমার কাছে সব কথা বলার আগে তোমাকে আমি ছাড়ছি না।"

শংকর চেষ্টা করেও রনবীরের কড়া থেকে যখন নিজেস্ব ছাড়িয়ে নিতে পারল না, তখন নেহায়েত বাধা হলে বলল, "আমি মন্দিরে দেবতার একটি নতুন মূর্তি দেখেছি। স্বয়ং ভগবান এটি দিয়ে গেছেন। সেই খবরটা তোমার বাবার কাছে পৌঁছাতে যাচ্ছি।"

ততক্ষণে আরো লোক এসে গেছে। তারা সকলে তাকে নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল। লোকজন তাকে এমনভাবে ঘিরে দাঁড়াল যে, তার ছুটে পালানোর কোন পথ রইল না। মূর্তি পাথরের না মাটির, সোনার না রূপোর সেই সব প্রশ্ন করে তার এত বিলম্ব ঘটলে দিল যে, গোপাল সকলের অলক্ষ্যে শংকরের আগেই যথাস্থানে পৌঁছে গেল। শংকর মুক্ত হয়ে দেখল, ততক্ষণে গোপাল নগরপতির নিকট পৌঁছে সকল বৃত্তান্ত বলে দিয়েছে। কিছু দূর যাবার পরই শংকর নগরপতি, পুরোহিত ও অর্জুনের

সঙ্গে গোপালকে ফিরে আসতে দেখল। নগরপতি জিজ্ঞেস করল, “তুমিও কি মূর্তি দেখেছ, শংকর?”

শংকর জবাবে বলল, “মহারাজ! আমিই তো ভোর রাতে স্বয়ং ভগবানকে মন্দিরের দরজায় মূর্তিটি রেখে যেতে দেখেছিলাম। তখন কাক পক্ষীও জাগেনি। আপনার নিকট খবর পৌঁছানোর জন্য ছুটে আসছিলাম। পথে লোকজনকে এ খবর বলতে বলতেই দেয়ী হয়ে গেল।”

গোপাল বলল, “মহারাজ! আমি তো মূর্তিটি মন্দিরের ভিতরে দেখেছি। তাহলে এখন হয়ত দেবতা স্বয়ং হেঁটেই দরজায় এসেছেন।”

নগরপতি এগিয়ে গেলেন। শংকরের কথায় প্রতি তিনি কোনই গুরুত্ব দিলেন না। পুরোহিত ঠাকুর বললেন, “আমি শংকরের কথা বিশ্বাস করি না। সে সব সময় মিথ্যে কথা বলে।”

মন্দিরে পৌঁছে শংকর বুঝতে পারল, গোপাল অনেক পরামর্শ দিলেন। মূর্তিটিকে সে নিয়ে মন্দিরের ভিতরে রেখেছে। ভগবানের রেখে দেয়া মূর্তি’র সামনে দলে দলে নগরের লোকজন এসে সোনা রূপা দান করতে লাগল। পুরোহিত ঠাকুর ভজন গাইলেন। শংকর অনুভব করল, এ দান বস্তুদের বেলায় গোপাল পুরোহিত ঠাকুরের সমান ভাগ পাবে। শংকর যদি কিছু পায়, তাহলে তা হবে অতি সামান্য।

ভিড়ের মধ্যে রনবীরও মোহিনী দাঁড়িয়ে নয়া-মূর্তি দেখছিল। রনবীর মোহিনীকে চোখের ইশারায় তিড় থেকে বের হতে বলল। মন্দিরের এক পাশে গিয়ে রনবীর মূদু হেসে বলল, “নতুন মূর্তির সম্বন্ধে তোমাকে একটা মজার কথা বলব।”

মোহিনী বলল, “তবে বলেই ফ্যালো।”

“এখানে নয়। ঝিলের নিকটে গিয়ে বলতে হবে। আমি সেখানে গিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। তুমি তাড়াতাড়ি এসো। মাথবের সম্পর্কেও অনেক জরুরী খবর আছে। যাবেতো?”

মোহিনীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে হাসি মুখে বলল, “ঠিক আছে, আমি এখুনি আসছি।”

রনবীর সোজা ঝিলের নিকে চলে গেল। মোহিনী ঝিলের নিকটে পৌঁছে রনবীরকে দেখতে পেয়ে বলল, “রনুদা! আমাদের এখন আর এভাবে চলাফেরা করা ঠিক নয়। তাই যা বলতে চাপ তাড়াতাড়ি বলে ফ্যালো।”

রনবীর বলল, “আমি বলার আগে একটি জিনিস যাচাই করে নিতে চাই।”

“কি যাচাই করবে?”

“মোহিনী! আমার মনে হয় ঐ মূর্তিটি মাথবের ভৈরী।”

“মাধব এত নিখুঁত মূর্তি তৈরী করতে পারবে, সেটা আমার বিশ্বাস হয় না।”

“আমার সঙ্গে এসো। তোমাকে আমি কিছু প্রমাণ দেখাব।”

মোহিনী একটু ইতস্ততঃ করে রনবীরের পেছন পেছন চলল। ঝিলের অপর দিকে ঘন গাছ-পালায় ঘেরা একটি ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করে রনবীর মাধবের মূর্তি তৈরী করার স্থানটিতে পৌঁছে গেল। সেখানে গিয়ে চারদিকে ছড়ানো ছোট ছোট পাথরের টুকরোগুলো দেখিয়ে সে বলল, “মোহিনী! ভাল করে দেখ। মূর্তিটি কি এই পাথরের তৈরী নয়?”

মোহিনী কয়েকটি পাথরের টুকরো হাতে নিয়ে বলল, “হ্যাঁ। তাই-ভ্রোঁ মনে হচ্ছে।”

রনবীর বলল, “মূর্তিটি অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় আমি মাধবকে এখানে বসেই সেটি তৈরী করতে দেখেছি।”

“কিন্তু ওটা মন্দিরে পৌঁছে দিল কে?”

“আমার মনে হয় মাধব ছাড়া একাজ কেউ করেনি।”

“যদি সমাজের লোক জানতে পারে যে, তারা যে মূর্তির উপর অকাতরে ধনসম্পদ ঢেলে দিচ্ছে, তা এক শূদ্র যুবকের তৈরী, তাহলে কি হবে?”

“স্থির সিদ্ধান্ত করার আগে আমি তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করে নিতে চাই।”

“কিন্তু মাধবকে তুমি এখন কোথায় পাবে?”

“কাছেই তাদের ঘর। চল খোঁজ করে আসি।”

“না, রনুদা! সেখানে আমার যাওয়া উচিত হবে না।”

“তুমি দূরে দাড়িয়ে থেকে, তাহলে কী হবে? চল।”

ঝোপ থেকে বের হয়েই তারা বশীর সুর শুনতে পেল। কিছু দূর এগিয়ে যেতেই দেখা গেল, শুকনো ঘাসের ঝোপের ওপর বসে মাধব বশী বাজাচ্ছে আর ভেড়াগুলো আপন মনে চরে বেড়াচ্ছে। সুখান ধীরে ধীরে তার নিকটে গিয়ে দাঁড়াল। মাধব আপন মনে বশী বাজিয়েই চলেমো রনবীর ডাকল, “মাধব!”

বশী মুখ থেকে সরিয়ে মাধব রনবীর ও মোহিনীকে দেখে লাফিয়ে উঠে বলল, “তোমরা কখন এবেলা? তাহলে তোমরা এলে! ভগবানের অশেষ কৃপা। বোসো, বোসো।”

রনবীর বলল, “না মাধব, বসবো না। একটা কথা শুধু তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই!”

“বল, কি কথা জিজ্ঞেস করতে চাও?”

“তুমি যে, মূর্তিটি তৈরী করছিলে, সেটি কোথায়?”

মাধব হকচকিয়ে গিয়ে বলল, “বোসো। আমি সব কথাই তোমাদের বলছি।”

রনবীর এদিক-ওদিক দেখে কিছু শুকনো ঘাস টেনে নিয়ে তার উপর বসে পড়ল আর কিছু ঘাস মোহিনীর দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, “মোহিনী তুমিও একটু বোসো।”

মাধব জিজ্ঞেস করল, “তোমরা কি মন্দির থেকে সরাসরি এখানে এসেছ?”

রনবীর বলল, “হ্যাঁ।”

“তাহলে আর আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? তুমি তো সবই জানো।”

“কিছু মূর্তিটি মন্দিরে নিয়ে গেল কে?”

“আমিই রেখে এসেছি।”

“তুমি তো এ মূর্তির পূজা করে অবতার হ’তে চেয়েছিলে, তাই না?”

“হ্যাঁ, এক সময় চেয়েছিলাম বটে। কিন্তু এখন আর কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য মূর্তির দরকার বোধ করি না। চাঁদ-সুরঙ্গ, পাহাড়-রান্না-পালো-বাতাস, গাছ-বৃক্ষ এসবই ভগবানের নিদর্শন। ওদের দেখেই ভগবানকে ভালবাসা যায়। তাকে ভালবাসা ও ভক্তি করার জন্য নিজের হাতের তৈরী মূর্তির সমানে মাথা নত করার কোন অর্থ হয় না। তাই এ মূর্তি যাদের কাছে লাগতে পারে, তাদের নিকটেই পৌঁছে দিয়েছি।”

“যদি তারা আসল ব্যাপার জানতে পারে, তাহলে তোমার কী শাস্তি হবে, ধারণা করতে পার?”

“যদি শাস্তি দিতে চাও তো দাও। তোমরা দু’জন যে শাস্তি দেবে তা আমি মাথা পেতে মেনে নেবো। এই গোপন শাস্তির কথা অন্য কেউ কখনো তো জানতেও পারবে না।”

ইতোমধ্যে একটি কাপড়ের ফুলেতে বেঁধে শাস্তা মাধবের জন্য কিছু খাবার নিয়ে এলো। রনবীর ও মোহিনীকে দেখে খুশীতে তার চেহারা ফুলের মত তাজা হয়ে উঠল। রনবীরের বুকও ধক্-ধক্ করতে শুরু করল। যৌবনের জোয়ার শাস্তার সমগ্র দেহে এক অতুলনীয় সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিয়েছে। সে-রূপের ঊজ্জ্বল্যে তার দরিদ্র বেশভূষাও রনবীরের চোখে মূল্যবান হয়ে উঠল। শাস্তাকে একবার দেখার আগ্রহই তাকে এত দূর টেনে এনেছে। সে মোহিনীকে বলল, “তুমি একে কেন মোহিনী?”

“চিনি না। শুধু মাধবের বোন শাস্তা।”

শাস্তা মাধবের কাছে চোখে চোখে অনুমতি চাইল।

মাধব বলল, “বোসো।”

শাস্তা মোহিনীর পাশে বসে পড়ল। মোহিনী নারী। সে শাস্তা ও রনবীরের চোখ দেখেই তাদের অন্তরের অবস্থা অনুমান করে ফেলল। সে নিজেও এক অদ্ভুত সংকটে দেখতেপেল।

শৈশব থেকেই রনবীরের সঙ্গে সে খেলাধুলা করে আসছে। তার মাতাপিতা এবং রনবীরের মাতাপিতার মধ্যে এ দু'জনের বিয়ের কথাবার্তাও প্রায় পাকাপাকি হয়ে রয়েছে। মোহিনী রনবীরের উপস্থিতিতে অন্য কারো চিন্তা করাও পাপ বিবেচনা করে। মাধবের প্রতিও তার মায়ী অপরিণীম। কিন্তু আজ অনুভব করল, মায়ার সীমা ছাড়িয়ে মাধবের প্রতি তার আকর্ষণ যেন আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। মাধবের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তার মনে হল, তার দৃষ্টি যেন মোহিনীর অন্তর-প্রদেশে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে নিয়েছে। কিন্তু সে অস্পৃশ্য। সে একজন শূদ্র যুবক। তাকে কেন্দ্র করে কোন স্বপ্নই রচনা করা সম্ভব নয়। মোহিনী মনে মনে বলল, "হায়! মাধব যদি রনবীর হ'ত!" পরক্ষণেই এই ধরণের চিন্তা মনে উদয় হবার দরম্ন তার অনুশোচনা হল। বলল, "রনুদা, চল যাই।"

রনবীর আরও কিছুক্ষণ শান্তার সামনে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু মোহিনীর তাকিদে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে উঠে দাঁড়াল। বলল, "মাধব! তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম, তাই।"

মাধব বলল, "প্রতিদিনই যদি এই রকম কষ্ট দিতে, তাহলে আমি বুঝই খুশী হ'তাম।"

রনবীর একটু খোঁচা নিয়ে বলল, "মোহিনী তোমার কথা বুঝ ভাবে কিনা, তাই আসতে বাধ্য হয়েছিলাম।"

মোহিনী রনবীরের খোঁচাটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, "শান্তা আজ যাই, তাই।"

শান্তা মাধবকে বলল, "আমি বাড়ী চলে যাবি, দাদা!"

মাধব সম্মতি জানালে শান্তাও রনবীর এবং মোহিনীর পেছন পেছন রওনা হল। রনবীর জিজ্ঞেস করল, "তোমার দাদা কি এখনও পাথর কেটে মূর্তি তৈরী করে, শান্তা?"

শান্তা বলল, "এখন আর করে না, পাঁচু কাকা তাকে বারণ করে দিয়েছেন তো, তাই, দাদা ঐ কাজটা ছেড়ে দিয়েছে।"

"তোমার মা ভাল আছেন?"

"ভালই আছেন, তোমরা তার সাথে দেখা করবে?"

রনবীর মোহিনীর সম্মতি চেয়ে বলল, "যাবে মোহিনী?"

"আজ নয়। অন্য একদিন যাওয়া যাবে! রনুদা শান্তাকে নিশ্চয়ই দেখতে আসবে কি বল, রনুদা!"

রনবীর কুন্ততে পারল; মোহিনী তাকে পূর্বের খোঁচাটি ফিরিয়ে দিল।

হালিখুখে শান্তাকে বিদায় নিয়ে তারা দু'জনে শহরের পথ ধরল।

মাধব তাদের গমন পথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তার অন্তরে এখন প্রবল

ঝড় উঠেছে। এক সময় সে অনুভব করল, তার দু'টি পা তাকে দ্রুত শহরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। রনবীর ও মোহিনীর নিকট পৌছতেই তার গতি শিথিল হয়ে গেল। পায়ের আওয়াজ শুনে রনবীর ও মোহিনী ফিরে দাঁড়াল। রনবীরের চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। মাধব হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গেল। এখন সে কি বলবে, কিছুই ঠিক করতে পারছে না। রনবীর দাড়িয়ে নরন ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "কি ব্যাপার, মাধব? তুমি কি কিছু বলবে?"

মাধব অসহায় অবস্থায় কিছুক্ষণ নীরবে দাড়িয়ে থেকে বলল, "আমি মোহিনীকে একটা কথা বলতে চাই।"

মোহিনীর কানের গোড়া লাল হয়ে উঠল। সে জিজ্ঞেস করল, "শুধু বলবে, বল।"

মাধব বলল, "আমি অস্বস্থ। তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আমার খেয়াল থাকে না যে তোমরা উচ্চ জাতের লোক। আমার আচরণে তুমি অসন্তুষ্ট হওনি তো?"

মোহিনী বিপাকে পড়ল। রনবীরের সামনেই মাধবের এ রকমের প্রশ্ন সত্যি তার জন্য খুব অপ্রতীকর ছিল। সে কি বলবে, ঠিক করতে পারল না। মাধব পুনরায় বলল, "তোমাদের মনে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা নিয়ে আমি কোন কথা বলি না। তবু, ইচ্ছা করলে তোমরা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবার মত অনেক ক্রটিই খুঁজে পাবে।"

মোহিনী এবার কথা না বলে অল্প পারল না, বলল, "তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবার আমার তো কোন অধিকার নেই, মাধব।"

মাধবের বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল, "এ অধিকার আমি তোমাকে দিচ্ছি, মোহিনী।" কিন্তু তা বলার মত সাহস হল না, তাই সে রনবীরকে লক্ষ্য করে বলল, "তোমাদের দেবতাকে আমি অমান্য করেছি। তবে তোমরা যে ভগবানকে স্বরণ কর, আমি তাকে অবশ্যই ভালবাসি। নিজের হাতে তৈরী করা মূর্তির পূজা করার চাইতে ভগবানের তৈরী দেবতার সঙ্গে প্রেম করা আমি উত্তম বিবেচনা করি। আমার বিবেচনার তোমরা ভগবানের নিজের হাতে গড়া দেবতা। তাই আমি তোমাদের ভালবাসি। তোমরা কি এর মধ্যে কোন অশোভন আচরণ দেখতে পাচ্ছ?"

মোহিনী বলল, "মাধব! আমরা তোমার কোন আচরণই খারাপ বিবেচনা করি না।" কথাটি বলেই সে লজ্জান্বিত বলল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল। বলল, "রনুদা, চল যাই।"

মাধব জিজ্ঞেস করল, "আবার তোমরা আসবে তো?"

রনবীর জবাব দিল, "কেন আসবে না? সময় পেলেই তোমাকে দেখতে আসব।"

রনবীর তো আসতেই চায়। কারণ শাস্তার সঙ্গে আলাপ করার তার খুবই ইচ্ছা। অবশ্য মোহিনী মনে মনে ভাবতে লাগল, এভাবে মাধবের সঙ্গে দেখাশোনা না করাই ভাল। কারণ সমাজের জাতিভেদ প্রথার সুউচ্চ প্রাচীর তাদের মাঝখানে যে অলংঘনীয় ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে, তা তাদের জন্য দুঃখ কষ্টের কারণ হতে পারে।

## ছাব্বিশ

মোহিনী ও রনবীরের সঙ্গে সর্বশেষ সাক্ষাতের পর মাধব কয়েকদিন অত্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে কাটাল। দেবমূর্তি তৈরীতে তার কয়েক মাস সময় কেটে গিয়েছিল। মনে আশা ছিল, দেবতার পূজা করে সে একদিন না একদিন অবতারই হয়ে যাবে। মোহিনীর সঙ্গে গিয়েই সে দেবমূর্তি দেখতে পেয়েছিল। মোহিনীর সংস্পর্শই তাকে ভগবানের মূর্তি গড়ার উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছিল। সে ভেবেছিল, ভগবান তার অরুপট তত্ত্বি ও সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে একদিন পাথরের মূর্তিকে বাকশক্তি দান করবেন। মূর্তি তখন বলবে, "মাধব! তোমার পূজায় আমি খুশী হয়েছি। বল, তুই কি বর চাস?" মাধব তখনই দেবমূর্তির চরণে নিজের মাথা রেখে বলবে, "ভগবান! কিছুই চাই না। শুধু মোহিনীকে দাও।" মাধব কল্পনার চোখে দেখছিল। ভগবান যেন "তথাস্থু" বলে তার আবেদন মনজুর করলেন। তারপর সমাজের সবার কাছে দৈববাণী করে জানিয়ে দিলেন, "মাধব আমার অবতার। তাকে কেউ শূন্য মনে করবে না।" আর এ ঘোষণার পর মোহিনীই তার কাছে ছুটে আসছে। মাধব মোহিনীকে নিয়ে এমন একটি সংসার রচনার স্বপ্ন দেখছিল, যেখানে মানুষে মানুষে কোন ভেদাত্মক নেই। উঁচু ও নীচু মর্যাদার পার্থক্য নেই। সকল মানুষই ভগবানের সৃষ্টি। তাই সবাই সমান। কিন্তু পাঁচু তার স্বপ্ন ভেঙে দিল। সে ব্যক্তিতে পারল, মূর্তি মাধবকে উঁচু মর্যাদায় পৌঁছে নিতে পারবে না। কারণ এ মূর্তিই সমাজে বিভেদ সৃষ্টির কারণ। তাই সে মূর্তিটিকে মন্দিরে পৌঁছে দিয়েছে।

[www.banglabookpdf.blogspot.com](http://www.banglabookpdf.blogspot.com)

কল্পনায় মাধব যে সুখের প্রাসাদ গড়ে তুলেছিল, তা ভেঙে চূরমার হয়ে গেল। মোহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উপযোগী কোন সুত্রই আর বাকী রইল না। মনে মনে সে ভাবল, 'হায়! এই মিথ্যা স্বপ্নে ডুবে থাকিও যে অনেক ভাল ছিল।' সে শূন্য হয়ে জন্মেছে। উঁচু জাতের নিকটে খেসার তার কোন অধিকারই নেই। অথচ তার মনের মন্দিরে মোহিনীর মূর্তি সদা সমাসীন। চরম নৈরাশ্যের মধ্যে একটি ক্ষীণ আশার আলো অবশিষ্ট জেগে উঠেছিল। মোহিনী যাবার বেলায় তাকে বলে গেছে, সে মাধবের প্রতি অসন্তুষ্ট নয়। তাবতে ভাবতে সে খিলের কিনারায় মাটির নীচে লুকোনো পাথর কাটার যন্ত্রপাতিগুলো বের করে আনল। তারপর কয়েকটি পাথরের টুকরো নিয়ে ঘরের কোণে বসে মোহিনীর মূর্তি তৈরীর কাজে লেগে গেল। পাথর কাটার খটাখট শব্দে কমল ঘরে

তুকে দেখতে পেল, মাধব একটি পাথরকে কেটে সুন্দর একটি তরুণীর মুখাকৃতি তৈরী করছে। মাকে দেখে মাধব বলল, "শাস্ত্রার জন্যে খেলনা তৈরী করছি, মা।"

কমল বলল, "শাস্ত্রা তো খেলনা নিয়ে বসে থাকার মত ছোট নয় মাধব। এত বড় মেয়ে, পুতুল দিয়ে কি করবে?"

মাধব বলল, "শাস্ত্রা পুতুল তৈরীর বায়না ধরেছিল, মা।"

শাস্ত্রা হঠাৎ ঠিক সেই সময়ই ঘরে এসে গেল। মাধবের হাতের পাথরটির দিকে ডাকিয়েই সে বুঝতে পারল, ওটা মোহিনীর চেহারা। মুখ টিপে হেসে বলল, "হ্যাঁ মা, আমিই দাদাকে একটি পুতুল তৈরী করতে বলেছিলাম। জানো মা, দাদা ভারী সুন্দর মূর্তি তৈরী করতে পারে।"

কমল ভাবল, মাধব একটা কাজ নিয়ে সময় কাটালে মন্থ দিন।

বিকালে পাঁচু ঘরে ফিরে পাথর কাটার শব্দ শুনে বলল, "দিদি! কিসের শব্দ হচ্ছে ওটা?"

কমল বলল, "শাস্ত্রা নাকি খেলা করবে। তাই মাধব তার জন্য পুতুল তৈরী করছে।"

পাঁচু ঘরে প্রবেশ করে মাধবকে অতি যত্নে পাথর ঘসে ঘসে মসূন করার কাজে মগ্ন দেখতে পেয়ে রাগে জ্বলে উঠল। বলল, "একই কি হচ্ছে, মাধব? শাস্ত্রা কি এখনও শিশু? তার কি পুতুল নিয়ে খেলা করা এখন আর শোভা পায়?"

মাধব বলল, "কাকু, তুমি যা ভয় করছ, আসলে তা সম্পূর্ণই অমূলক। আমি আর দেবতার মূর্তি তৈরী করছি না। তুমি আমার চোখ বুলে দিয়েছ। দেবমূর্তির প্রতি আমার এখন আর কোন আকর্ষণ নেই।"

পাঁচু মাধবের কথায় পুরোপুরি আকুল না হলেও আর বাড়াবাড়ি করল না। কারণ, মাধব যা কিছুই করতে চায়, সোপাল করে না। সুতরাং আশংকার কিছুই নেই।

কয়েক দিনের মধ্যেই মাধবের মূর্তি তৈরীর নেশা এত প্রবল হয়ে উঠল যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে অবিরাম পাথর কাটা এবং মসূন করার কাজে মগ্ন হয়ে থাকে। ক্লান্ত হয়ে গেলে বীশী রাজার এবং বীশীর বুক থেকে একটি করুণ সুর চার ধারে কোঁপে কোঁপে ছড়িয়ে পড়ে। পুতুল তৈরীর কাজে মাধবের এত মনোযোগ শাস্ত্রাকেও অবাক করে দিল।

পাঁচু কখনও কখনও মাধবকে মেঘ চরানো এবং মাছ শিকার করার জন্য সঙ্গে নিয়ে যায়। মাধব কাজ শেষ করে সোজা ঘরে ফিরে আসে। কয়েক সন্তাহ পর ঘরে একটি সুন্দর পুতুল দেখে শাস্ত্রা খুব খুশী হল। সে মাধবের কানে কানে বলল, "এটা যে অবিকল সেই মোহিনী দেবী হয়ে উঠেছে, দাদা।"

মাধব আপত্তি করে বলল, "না, না, এটা অবিকল মোহিনীর মত হয়নি শাস্ত্রা! আমি আরও একটি মূর্তি তৈরী করব। সেটি তৈরী করতে আমি আমার সমস্ত শক্তি কাজে



লাগাব, দেখিস।

ঠিক পরের দিনই মাধব অন্য একটি নতুন পাথর কেটে মূর্তি তৈরীর কাজে লেগে গেল।

## সাতাশ

রনবীর ও মোহিনীর বয়সে মাত্র দু'বছরের ফারাক। শিশু থেকে দু'জনে একত্রে খেলাধুলা করে এসেছে। একই গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করেছে। তাদের মাতাপিতা ভালভাবে জানে এবং গভীরভাবে ভালবাসে। অন্য ভবিষ্যতে তাদের বিয়ে প্রায় সুনিশ্চিত বিধায় যৌবনের কোঠায় পা সেয়ার পরও তাদের মেলামেশায় কেউ আপত্তি করে না। রনবীর সুদর্শন, সাহসী ও বুদ্ধিমান যুবক। সে মোহিনীকে অন্তর দিয়েই ভালবাসে। কিন্তু শাস্তার আকর্ষণ কেন যে তার মনে রেখাপাত করল, তা সে অনুমান করতেই পারে না। নানান ছলছুতায় আরম্ভ করে সে ঝিলের ধারে ঘুরে বেড়ায়। মাধবের সঙ্গে গল্প করে। শাস্তা এলে তার মনে এক নতুন সুর বেজে ওঠে। পাঁচুর সঙ্গে দু' একদিন রনবীরের দেখা হয়েছে। পাঁচু টাঁচু জাতের কোন মানুষকেই ভাল চোখে দেখে না। কিন্তু রনবীরকে সে খুবই পছন্দ করে। রনবীরের পোশাক পরিচ্ছদ হুবহু সুখদেবের মত। সুখদেবেরই ভঙ্গিমায় তাঁর কোমরে তরবারি খোলে। তাকে সেদিন পাঁচু জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনি কি রাজার সেনাপতি?" রনবীর বলেছিল, "না, পাঁচু কাকা! আমার বাবা ছিলেন সেনাপতি। এখন অবশ্যি তিনি অবসর নিয়েছেন। এই শহরের নগরপতিও তিনিই।"

"তাহলে তো আপনার বাবা ছোট জাতের মানুষদের খুব ঘৃণা করেন?"

"তিনি এখন তাদের প্রতি সব রকম দুর্ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছেন।"

"তুনেছি, গঙ্গারাম নামে রাজার এক সেনাপতি আছেন। তিনি নাকি শূদ্রদের প্রতি খুব অত্যাচার করেন।"

"সে তো অনেক দিন আগে মারা গেছে, আমার জন্মের আগেই তাকে এক বীর পুরুষ হত্যা করেছে।"

"সে বীর পুরুষটি কি শূদ্র ছিলেন?"

“রনবীর মাথা নেড়ে বলল, না, পাঁচ ককা, তিনি শূন্র নন। তিনি ছিলেন ক্রিয়।  
তার নাম সুখসেব। আমার পিতার বিশেষ বন্ধু ছিলেন তিনি।”

“আপনার পিতাজীর নাম কি রামদাস?”

“ঠিক তাই, কিন্তু, আপনি কি করে জানলেন?”

“লোক মুখে শুনেছি।”

সেই দিনই পাঁচ সুখসেবের মুখে রামদাসের সকল কাহিনী শুনেছিল। এরপর সাত  
পাঁচ ভেবে সে কথা সে চাপা দিল।

রনবীর পাঁচ ও মাধবের নিকট থেকে বিনায় নিয়ে ঝিলের পাশে গেল। সেখানে সে  
শান্তাকে কলসী ভরতে দেখে খুশিতে ভগমগ হয়ে উঠল। একক্ষণ সে তারই জন্য  
ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছে। কাছে যেতেই শান্তা কলসীটি মাটিতে রেখে একটি গাছের  
আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। রনবীর বলল, “শান্তা! তোমার জন্যই আমি একক্ষণ অপেক্ষা  
করছি।

শান্তা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। সে লাজুক মুখে বলল, “মোহিনী ভাল আছে?”

“ভাল আছে। তোমার কথা সে বার বার বলে।”

রনবীর এগিয়ে গিয়ে শান্তার মুখোমুখি দাঁড়াল। বলল, “তোমার দাদা আজকাল কি  
করে শান্তা?”

“মূর্তি তৈরী করে। দাদা মোহিনীর মূর্তি খানি মূর্তি গড়েছে। একখানি তো অবিকল  
মোহিনীর মতই হয়েছে।”

একজন শূন্র মোহিনীর মূর্তি তৈরী করছে—এটা রনবীরের কাছে খুবই আপত্তিকর  
বলে মনে হল। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভেবে দেখল, মাধব ও মোহিনীর মধ্যে রনবীরই  
যোগাযোগ করে নিয়েছে। নইলে তাদের দেখা সাক্ষাতও হয়ত ঘটতো না। তাছাড়া, সে  
নিজে গত কয়েকদিনে শান্তার সঙ্গে যেভাবে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে, তা কেন্দ্রিক দিয়েই  
বৈধ নয়। এ শূন্র বাসিন্দাকে সে কিছুতেই বিয়ে করতে পারবে না। মোহিনীই তার  
ভবিষ্যৎ জীবন সঙ্গিনী। অসম্ভাবস্থায় শান্তার সঙ্গে এই মেলামেশা কপটতা ছাড়া কিছুই  
নয়। যদি সে শান্তার সারিষ্য লাভের জন্য বারবার ঝিলের নিকট ছুটে আসতে পারে,  
তাহলে মাধবের মোহিনীর মূর্তি গড়ায় অপরাধ কি?

শান্তার আকস্মিক প্রশ্নে রনবীরের চিন্তায় হেস পড়ল। শান্তা প্রশ্ন করল, “মোহিনী কি  
আপনার বোন?”

“নাভোন।”

“কবে আপনার সাথে তার সম্পর্ক কি?”

“তার বাবা আমার বাবার বন্ধু, বাস।”

এ সময় শংকরকে দ্রুত ধাবমান একটি পাণ্ডীর লেজ ধরে পেছনে পেছনে ছুটে এই দিকে আসতে দেখা গেল। শান্তা কলসীটি কাঁখে তুলে নিয়ে বলল, “আমি যাই।”

রনবীর বলল, “যাবে? ঠিক আছে। আবার দেখা হবে।”

শংকর বহু চেষ্টা করলেও পাণ্ডীর গতিরোধ করতে পারল না। অবশেষে তাকে ছেড়ে দিয়ে সে রনবীরের নিকটে এসে বলল, “গরুটা বড় পাণ্ডী। আর আপনি এখানে!”

রনবীর বলল, “এসেছিলাম তো শিকারের জন্যে। কিন্তু তোমার মুখ দেখলে তো শিকার মিলবে না। তাই এখন ফিরে যেতে হচ্ছে।”

শংকর রসিকতা করে বলল, “শিকার তো ঐ চলে যাচ্ছে।”

“কই?”

শংকর শান্তার দিকে ইশারা করে বলল, “ঐ যে, ঝিলের পাড়ে, ঝোপের আড়ালে কলসী কাঁখে হারিয়ে যাচ্ছে।”

রনবীর বলল, “তুমি না ব্রাহ্মণ! এমন অশ্লীল উক্তি করতে তোমার লজ্জা হয় না?”

শংকর বলল, “রাগ করবেন না বাবু। আমি একটু রসিকতা করলাম মাত্র।”

রনবীর বলল, “রসিকতা করার জন্যেও মরণ লাগে। তগবান তোমার মাথায় ঐ জিনিসটি একবিন্দুও বরাদ্দ করেননি, বুঝেছ?”

শংকর বিড় বিড় করে কি সব বলতে বলতে মন্দিরের দিকে রওনা হয়ে গেল। রনবীরও বাড়ীর পথ ধরল।

## আঠাশ

শান্তা ও কমল রান্নার কাজে ব্যস্ত, ঠিক এমনি সময় বাইরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে সেয়ে কমল জিজ্ঞেস করল, “ঘোড়ার চড়ে কে গেল?”

শান্তা হুঁসুটি দিল, “আমি জানিনে তো, মা!” বলেই ঋনিকক্ষণ সে কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল।

কমল কিছুই ঠাহর করতে পারল না।

ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ ধীরে-ধীরে দূরে মিলিয়ে যেতেই শান্তা উদ্বিগ্ন মুখে বলল,  
“আমি চানু করে আসি মা?”

কমল বিম্বিত হয়ে বলল, “সকালে একবার চানু করে এলি যে?”

শান্তা বলল, “বড় পরম লাগছে মা!”

কমল ভাবল রান্নার কাজে সাহায্য করতে গিয়ে গুর হয়ত গরম লেগেছে। তাই ভেবে সে বলল, ‘যাবি যা, চানু সেরে তাড়াতাড়ি করে চলে আসিস। পেরি করিস নে যেন।’

শান্তা ধীরে টাটে একটি কাপড় হাতে নিয়ে খিলের দিকে চলে গেল। আয়ের চোখের আড়াল হ’তেই সে রীতিমত দৌড়াতে শুরু করল। রনবীর তখন একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে শান্তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

শান্তা তার নিকট পৌছতেই সে বলল, “তুমি এসেছ শান্তা! কি করে বুঝলে যে, আমি এখানে এসেছি?”

“আমি আপনার ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনেই বুঝতে পেরেছি। আপনি আমাদের ঘরের পাশ দিয়ে এলেন না?”

“এলাম তো, তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি হয়নি তো?”

“ক্ষতি হবে কেন? আমি বলছি যে, আপনি আমাকে ইচ্ছিতে ডাকার জন্যেই ওদিকে গিয়েছিলেন, ঠিক তাই না?”

“তা হবে হয়ত। আচ্ছা, তোমাদের ঘরে কতদূর কে কে ছিল?”

“কাকা ও দাদা তো শিকারে গেছেন। তবু মা আর আমি ঘরে ছিলাম। মা ঘোড়ার শব্দ শুনে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ঘোড়ায় চড়ে কে গেল? আমি জানতাম তাও মাকে বলিনি। বলেছি, আমি জানি না।’

“এখন এলে কেমন করে?”

“মাকে বলেছি, চানু করতে যাচ্ছি।”

“ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনেই তুমি ছুটে এলে?”

শান্তা হাসি মুখে প্রশ্ন করল, “এদিকে আপনি কেন আসেন, বলুন তো?”

“তা তো জানিনা!” রনবীর জবাব দিল, “তবে না এসে যে পারি না। সমস্তই জানি, তোমার ও আমার মাকখানে সমাজের উঁচু নেয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে। তোমার সঙ্গে আমার এভাবে মেলামেশা সীমাল কিছুতেই রবদাপ্ত করবে না। তবু কেন যে আসি, তা তো বলতে পারিনে, শান্তা!”

“আমি ছোট জ্ঞাতে জন্মেছি। আমার তো বামণ হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়ানো শোভা পায় না। তবু আপনি আমাকে প্রথয় দিয়ে সাহস বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তো

আপনার সাফাৎ না পেলে আমারও মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।”

“হ্যাঁ, তাই আমি ভাবছি। এ ধরনের মেলামেশা আমাদের বন্ধ করাই দরকার। মনে কর, আমি যদি আর তোমার সঙ্গে দেখা করতে না আসি, তাহলে তুমি কি খুব দুঃখ পাবে?”

শান্তা বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, “ও প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে আপনার মানসস্ত্রম নষ্ট হলে আপনি যা ভাল মনে করেন, তাই করবেন। আমার কথা আপনি ভাববেন কেন?”

হঠাৎ ঘাস পাতার তিতর থেকে সবুজ বর্ণের একটি চলন্ত জীব মাথা উঁচু করতেই শান্তা চমকে উঠে রনবীরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। পরক্ষণেই শান্তার মুখ থেকে একটা অক্ষুট আর্তনাদ শোনা গেল। রনবীর হতচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, “কি হয়েছে শান্তা! তুমি অমন করছ কেন?”

“একটা সাপ আপনাকে দংশন করতে যাচ্ছিল।”

রনবীর পলায়মান সাপটিকে দেখতে পেয়ে বলল, “ওটাতো খুব বিবাক্ত সাপ, দেখছি।”

শান্তা বলল, “আমি তাই শুনেছি। ওই সর্বস্ব রক্তের সাপ ঘাস পাতার মধ্যে মিশে থাকে। যাকে কামড়ায় তার নাকি খুব ঘুম পায়। আর কোনদিনই সে জেগে ওঠে না।।”

“তোমার যেচোখ বন্ধ হয়ে আসছে! তাহলে সাপটি কি তোমাকে কামড়িয়েছে?”

“হ্যাঁ।”

“কোথায়?”

শান্তা পায়ের একটি জায়গার দিকে অংশুলি নির্দেশ করল। রনবীর দেখতে পেল, তার পায়ের একটি জায়গা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে।

রনবীর বলল, “শান্তা, তুমি কি নিজের জীবন নিয়ে আমাকে রক্ষা করলে?”

শান্তা মান হেসে বলল, “যদি আপনার কোন উপকারে এসে থাকি, তাহলে তো অন্য সার্থকত্ব।”

“না, না, তা হতে পারে না। চল, ঘরে চল। আমি তোমার জন্যে সাপুড়ে নিয়ে আসব।”

“আপনি যদি আমার সঙ্গে দেখাই করতে না আসেন, তা হলে আমার বেঁচে থাকার কি দরকার? তবু চাইতে আপনার পদতলে আমার মৃত্যুই কাম্য।”

“না, শান্তা! আমি বারবার আসব। তোমার এ জীবন এভাবে বিলিয়ে দেয়া চলবে না।”

শান্তা ক্রমেই নির্দীব হয়ে পড়তে লাগল। রনবীর সকল সংকোচ কাটিয়ে তাকে

পাঁজাকোলা করে ঘরের দিকে নিয়ে চলল। শূদ্র বালিকার আত্মত্যাগের বাসনা তার সকল কৌশলিন্য ধূলায় মিশিয়ে দিল। ঘরে পৌঁছতেই কমল অস্থির হয়ে প্রশ্ন করল, "তুমি কে? আমার শাস্তার কি হয়েছে?"

"ওকে সাপে মর্শন করেছে।"

"আমার শাস্তা!" বলে কমল চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

রনবীর বলল, আমি এফুনি সাপুড়ে ডেকে আনছি।"

"কোথায় পাবে বাবা, সাপুড়ে?"

"আট ক্রেশ দূরে একজন সাপুড়ে আছে। আমি তাকে চিনি। আমি সেখানেই যাচ্ছি। খুব বেশি সময় লাগবে না।"

"ততক্ষণ কি আমার শাস্তা বেঁচে থাকবে?"

"আমার ঘোড়া আছে। আমি এফুনি ছুটে যাচ্ছি।"

কমল সাপের মর্শিত স্থানটি ফোলা দেখে বলল, "বাবা, তুমি যেই হও, যাবার আগে শাস্তার পায়ের ফোলা জায়গাটি কেটে দিয়ে যাও। বিবাক্ত রক্ত বের হয়ে গেলে, মা আমার বেঁচেও যেতে পারে।"

"খারাব কোন অস্ত্র আছে?"

কমল খুঁজে খুঁজে একটি মরচে ধরা খাণ্ড তরবারি এনে দিল। রনবীর খাণ্ডটি হাতে নিয়ে অবাক হয়ে দেখল, ওটাতে তার পিতার নাম লেখা রয়েছে। খাণ্ড থেকে তরবারি বের করতেই ওটা চক্চক করে উঠল। ক্ষিপ্ত হাতে রনবীর শাস্তার পায়ের ফোলা স্থানটির খানিকটা চামড়া কেটে দিল। ক্ষত স্থান থেকে কালো রক্ত বের হতে লাগল। রনবীর বলল, আপনি শাস্তাকে দেখুন মা! আমি সাপুড়েকে আনতে যাচ্ছি।"

## উনত্রিশ

রনবীর দ্রুত বেগে ঘোড়া চালিয়ে সাপুড়ের বাড়ী অতিমুখে রওনা হল। পথে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। কিন্তু রনবীর মোটেই পরোয়া করল না। বৃষ্টিতে ভিজে সপসপ হয়ে সে যখন সাপুড়ের গ্রামে পৌঁছল, তখন বেলা শেষ হয়ে এসেছে। একটি বাড়ীর সামনে ঘোড়া বাঁধিয়ে সে লোকজনদের ডাকল। কোমরে তরবারি খুলানো সুদর্শন উচ্চ বাঁশের

যুবককে ঘোড়ার শিঠে সওয়ার সেখে ভয়ে কেউ ঘর থেকে বের হ'তে চাইল না। পাড়ার সরদার জানতে পেরে গলায় গামছা জড়িয়ে ছুটে এসে রনবীরকে মাথা নুইয়ে প্রণাম করল। হাতজোড় করে বলল, "কি আজ্ঞা মহারাজ! এ দূর্যোগের দিনে আমরা আপনার কি সেবা করতে পারি? বৃত্তিতে আপনি ভিজ্ঞে গেছেন। আমাদের গরীবের কুটিরে পদধূলি দিলে আমরা আশ্বিন ছেলে আপনার শীত দূর করতে পারি।"

রনবীর বলল, "তোমার নাম কি?"

"আমার নাম যোগেন, মহারাজ! আমি এ পাড়ার সরদার।"

"এই গ্রামে যে একজন সাপুড়ে ছিল, কোথায়?"

"সে ওই পাড়ায় একটি রোগী সেখতে গিয়েছে। বৃত্তির ঘনি সস্তবতঃ সেখানেই আটক হয়ে পড়েছে।"

"আমি সেখানেই যাব। আমাকে পথ দেখিয়ে দিতে পারবে?"

"একশো বার মহারাজ! কিন্তু এ বৃত্তির মধ্যে আপনার যাবার দরকার কি? আপনি একটু গরীবের কুটিরে বিশ্রাম করুন। আমি তাকে খুঁজে আনছি।"

"না, না, আমিই যাব। খুব তাড়াতাড়ি আমাকে যাওয়া দরকার।"

সরদার এবং মহন্তার আরও কয়েকজন মিলে নিকটের পাড়ার দিকে রওনা হল। সরদারের আদেশে একজন যুবক রনবীরের ঘোড়ার তন্তাবথানে রয়ে গেল। একটি কুটিরে গিয়ে দেখা গেল, সাপুড়ে ভাং খেয়ে নেশায় বুন হয়ে পান গাইছে। সরদার তাকে ডেকে বলল, "কালু, বের হয়ে চল। এখুনি মহারাজের সঙ্গে তোমাকে শহরে যেতে হবে।"

কালু বলল, "আমি কোথাও যাব না। মহারাজই আসুন আর সেনাপতিই আসুন। আমি এ বৃত্তির দিনে বের হ'বো না।"

সরদারের হুকুমে দু'জন যুবক কালুকে জোর করে ধরে নিয়ে চলল, অপর একজন তার ঠায়ে ধরে থলেটি উঠিয়ে নিয়ে রওনা হল। ঘোড়ার নিকটে পৌছে সরদার বলল, "মহারাজ! আপনি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঠায়ে ধরে থলেটি নিজের কাছে রাখুন। আমি একে ঘোড়ায় তুলে দিচ্ছি।"

সরদারের নির্দেশে কয়েকজন লোক কালুকে পাঁজাকোলা করে ঘোড়ায় বসিয়ে দিয়ে বলল, "শক্ত করে ধর। তা না হলে পড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙ্গে মারা পড়বে।"

বৃত্তির ধার ও ঘোড়ার বেগ কালুর নেশা ছাড়িয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সচেতন হয়েই রনবীরের কোমর ধরে বসল। কুটিরে পৌছে রনবীর ভিজ্ঞেস করল, "শান্ত কোথায়?"

শান্তা এক পার্শ্বে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়েছিল। কালু শান্তাকে পরীক্ষা করে বলল,

“তয়ের কোন কারণ নেই। জায়গাটা কেটে দিয়ে খুব ভাল করেছেন। সাপটাও খুব বেশী বিযাক্ত নয় বলে মনে হচ্ছে।”

সে দংশিত স্থানে একটা মালিশ লাগিয়ে দিল। এক জাতীয় চূর্ণক গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে চামচ দিয়ে শান্তার মুখে ঢেলে দিল। ঘণ্টা খানিক সময় কেটে যাবার পর শান্তা চোখ মেলে তাকাল।

রনবীরকে চিত্তিত মুখে তার মুখের উপর ঝুঁকে থাকতে দেখে শান্তা বলল, “আমি ভাল আছি।”

রনবীর অপ্রসঙ্গল কণ্ঠে বলল, “তুমি শীগুণীর সুস্থ হয়ে উঠবে, শান্তা!”

শান্তাকে সুস্থ হতে দেখে রনবীরের ক্ষুধা অনুভব হল! পছন্দ রনবীরের পরিশ্রম ও সারানিন অনাহারে থাকার বিষয় জানত। ঘরে দুধ মাখন সব কিছুই আছে। কিন্তু শূদ্রদের ঘরে উঁচু জাতের যুবককে খাবার অনুরোধ করে সে অপরাধী হয়ে যাবে বলে ভয় ছিল। আবার ভাবল, এ যুবক সুখদেবেরই মত। হয়ত সে এসব-কোথা-ছুরির উর্ধে। কিন্তু তবু মাটির বাসনে তাকে কী করে খাবার দেয়া যায়। পুষ্কার পছন্দ অরণ হল, সুখদেব মাটির বাসন অপছন্দ করতো না। রনবীরও হয়ত অর্পছন্দ করবে না। কিন্তু সুখদেব তো কমলের জন্য সব কিছুই করেছিল। রনবীর কালু জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করবে? তবে কি রনবীরও শান্তার জন্য এত বড় ঝুঁকি নিজে গ্রহণত হবে? পছন্দ ওদের দিকে দেখল। রনবীর ও শান্তার চারটি চোখ পরস্পরের নিকট নীরব ভাষায় মনের আবেদন পেশ করছে।

রনবীর বলল, “তাহলে আমি বাড়ী খাই-বাবা হয়ত চিন্তা করছেন। সকালে আবার আসব। সাপুড়ের দিকে একটি সোনার আংটি এগিয়ে দিয়ে সে বলল, “আমার কাছে আজ আর কিছু নাই তাই কালু। আবার অনেক কৃপা করেছেন। এখন এটি রাখুন। কাল সকালে এসে আমি আপনার পুষ্কার দেব। ততক্ষণে শান্তাও হয়ত অনেক সুস্থ হয়ে উঠবে।”

সাপুড়ে লোলুপ নজরে সোনার আংটিটির দিকে তাকতেই কমল বলল, “না, না, তা হ’তে পারে না। আমার কাছে শান্তার বাবার একটি চিহ্ন আছে। তাই আমি দেব।” বলতে বলতে কমল বাস্তব থেকে ঝুঁজে পুরাতন একটি সোনার আংটি এনে রনবীরের হাতে দিল। সাপুড়ে ঝিকিয়ে বলল, “শান্তার বাবা বেঁচে নেই?”

কমল ধরা গলায় বলল, “না বাবা সে বেঁচে নেই।”

সাপুড়ে বলল, “আমি বিশ্বাস দুঃখিনীর কোন কিছু গ্রহণ করি না। শুটা আপনার নিকটই রাখুন।”

কমল বলল, “ওটা তোমার হাতেই থাক, রনবীর।”

রনবীর আংটিটি নিয়ে আলোর নিকটে দাঁড়াতেই দেখতে পেল, ও’তে সুখদেবের



নাম খোদাই করা রয়েছে। পূর্বেই সে তরবারিতে তার পিতার নাম দেখতে পেয়েছিল। খুশী হয়ে মাধবকে জিজ্ঞাস করল, "তোমার পিতাজীর নাম কি সুখদেব?"

মাধব বলল, "হ্যাঁ।"

রনবীর মাধবকে বৃকে জড়িয়ে ধরল। তারপর শান্তার নিকেট নিয়ে বলল, "আমি তোমাকে একটি জিনিস দিচ্ছি। গ্রহণ করতে বিধা করবে না আশা করি।"

আণ্টটি তার হাতে পরিয়ে দিয়ে বলল, "তোমার পিতাজীর এ ছিন্ন তোমার হাতেই থাকবে সৎগত।"

কমলের দিকে ফিরে রনবীর বলল, "আমার বাবার নাম বললে হয়ত আমাকে চিনবেন। আমি রামদাসের ছেলে।"

কমল রনবীরের মাথায় স্রেহের হাত বুলিয়ে বলল, "বাবা! একন্যাই পরের দুঃখ মোচনে তোমার এত উৎসাহ। রামদাসই আমাদের কলেসখানা থেকে উদ্ধার করেছিলেন। আর আজ তুমিই আমার শান্তার প্রাণরক্ষা করলে।"

রনবীর পিছুকে লক্ষ্য করে বলল, "আজ তাহলে মাই।"

পিছু বলল, "চলুন! ঘোড়া গাছ তলায় বধি আছে।" কিছুদূর যাবার পর পিছু হঠাৎ থেমে গেল। রনবীর বলল, "কি হল?"

"ওই দেখুন না গাছের আড়ালে একটি লোক লুকুচ্ছে মনে হয়।"

রনবীর বলল, "কে ও? একটু দাঁড়াও তো।"

সঙ্গে সঙ্গে লোকটির ছুটে পালানোর শব্দ শোনা গেল। পিছু বলল, "নিশ্চয়ই লোকটি ঘোড়া চুরি করতে এসেছিল।"

রনবীর বলল, "বড়ই দুঃখের বিষয়। বেচারার ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে গেল।"

পিছু বলল, "আপনি অবিকল সুখদেবেরই মত।"

## ত্রিশ

পিছুর নিকেট থেকে বিনায় হয়ে রনবীর ঝিলের দিকে এগিয়ে গেল। একটি গাছের সঙ্গে ঝোড়টিকে বেঁধে সে ঝিলে নেমে ভাল করে গা ধুয়ে নিল। তারপর বৃত্তির এক কিনারা পরিধানে রেখে অপর অংশের পানি নিংড়ে সে-অংশ পরিধান করল এবং

ভিজা অংশটুকু পুনরায় নিংড়ে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হল। শান্তার প্রাণ রক্ষার উপলক্ষ্য হতে শেরে আজ তার আনন্দের সীমা নেই। এ শূদ্র বালিকাকে সাপে কামড়ানোর পর তার চোখের সামনে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। রনবীর অনুভব করল, ভগবানের বিশেষ কৃপায় তার দুনিয়ায় আবার আশার আলো ছুঁলে উঠেছে, সে মনে মনে বলল, "ভগবান! এ সরল প্রাণ দুর্বল মানুষদের অত্যাচারী স্বার্থপরদের খরচ থেকে উদ্ধার করার জন্য তোমার দুনিয়ায় এক মহাপুরুষের আবির্ভাব সর্বোচ্চ! তুমি সৃষ্টি করেছিলে মানুষ। কিন্তু সমাজ মানুষের একটা বিরাট দলকে শূদ্রে পরিণত করেছে। তারা তোমার মন্দিরে আসতে পারে না। তোমার পূজা করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ। তোমার গুণকীর্তন করলে তারা অপরাধী হয়, সাজা ভোগ করে। আমাদের স্পর্শ করলেও নাকি সমাজের লোকদের সেই অপবিত্র হয়ে যায়। ভগবান! তুমি সৃষ্টি করার সময় সকলকে একই ধরনের অন্ন-প্রত্যক্ষ দান করেছ। তোমার আশ্রয়-রাগাস, রৌদ্র-বৃষ্টি ভোগ করার সমান অধিকার সকলেরই জন্য। অথচ তোমার মন্দিরে যাওয়া, তোমার পূজা করা কিছু লোকের জন্য কেন নিষিদ্ধ হবে? এ কারণে নিকট আইন তোমার আইন হতে পারে না। সমাজের স্বার্থপর লোকদেরই দায় এসব। তোমার এ সুন্দর পৃথিবীতে আজ অসংখ্য মানুষ নির্যাতিত, পদদলিত। তাদের উদ্ধার করার জন্য তুমি একজন ব্রাহ্মকর্তা পাঠাও।"

প্রার্থনার পর রনবীর ভোরের আলোতে শহরের দিকে হাঁটতে লাগল। কিছুদূর অগ্রসর হ'তেই কয়েকজন সিপাহীর সে সাফল্য পেল। তারা তাকেই বুজিয়েছে। সারারাত শহরের আনাচে কানাচে তারা তাকে খুঁজে বেড়িয়েছে। রনবীর বুঝতে পারল, তার পিতা নিশ্চয়ই খুব দুর্ভাগ্য পড়েছেন। রাত আরও দ্রুত বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল। কিছুদূর যেতে না যেতেই সে তার পিতা, অর্জুন এবং শহরের আরও অনেক বিশিষ্ট লোককে দেখতে পেল। তারা একত্রে মন্দিরেই আসছে। রামদাস তাকে দেখেই জেঁটিয়ে বলে উঠল, "এই যে রনবীর! আমরা বাবা, আমাদের সারারাত খুব কষ্ট দিয়েছি। কোথায় গিয়েছিলে কলতো?"

রনবীর লজ্জিত হয়ে বলল, "আমি শিকারের উদ্দেশ্যে দূরে গিয়েছিলাম বাবা। পরে বৃষ্টির দরুন এক জায়গায় আটক হয়ে পড়ি।"

"যাও, যাও! তাকে আটকি বাড়ী চলে যাও। সব কথা পরে শুনবা।"

দুপুর বেলা খুম থেকে জেপে উঠেই রনবীর দেখল, মোহিনী তার বিছানার পাশে দড়িয়ে আছে। মোহিনী মৃদু হেসে বলল, "রনবীর! আমি আরও দু'বার এসেছিলাম। তুমি তখন খুব ঘুমিয়েছিলে, তাই আপনো ঠিক মনে করিনি। এবার অতি কষ্টে তোমার ঘুম ভাঙলাম। বাবা তোমার পিতাঙ্গীর সঙ্গে তোমাকে সারারাত তালশ করেছেন। মা'ও সারারাত ঘুমিয়েছেন। তুমি ছিলে কোথায়?"

রনবীর হাই তুলে উঠে বসল। বলল, "তোমার সঙ্গে মিথ্যে কলব না মোহিনী! আমি

ঝিলের ওপারে গিয়েছিলাম।”

“সারারাত সেখানে কাটালে?”

“মোহিনী! জানো, শান্তাকে সাপে কেটেছিল?”

“বল কি? তাই নাকি?”

“হ্যাঁ।”

“তারপর এখন সে কেমন আছে?”

“বোধহয় ভাল হয়ে যাবে। আমি আট-দশ ফ্রেশ দূরে নদীর উপর থেকে একজন সাপুড়েকে আনতে গিয়েছিলাম।”

“এত ঝড়-বৃষ্টির ভিতরে তুমি নদীর ওপারে কি করে গেলে?”

“সে অনেক কষ্টের কাহিনী। যাহোক, তুমি কি শান্তাকে দেখতে যাবে?”

“নিয়ে চল।”

“তাহলে তুমি তৈরী হয়ে এসো। আমি ঝিলের এপারের তোমার জন্য অপেক্ষা করব। এসময় পথে লোকজন থাকে না, তবু যদি কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, বলবে, মন্দিরে যাচ্ছি।”

## একত্রিশ

শংকর কিছুকাল যাবৎ অনুভব করছিল যে, নগরপতি, মন্দিরের পুরোহিত ও শহরের সিপাই সকলেই ন্যূনতম তেল দিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে, আর এদিকে রনবীর ধর্ম নষ্ট করার পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আর সকলে উদাসীন হয় হোক, শংকর ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব থেকে কিস্তাবে নিজেকে উদাসীন রাখতে পারে? পরন্তু রনবীর যখন ঘোড়ায় চড়ে গেল, তখন সৈন্যবাহিনীর দিকে যায়নি। শংকরের মনে সন্দেহ জাগল, সে ঝিলের দিকে ছুটে গেলে, সেখানে রনবীরের ঘোড়াটিকে মাথবের জীর্ণ কুটিরের পাশে দেখা গেল। শংকর গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রনবীরের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগল। রনবীর সেই সময় ঘোড়ায় চড়ে আবার দ্রুত অন্য দিকে চলে গেল। শংকর বুঝতে পারল, রনবীর শহরের বাইরে কোথাও যাচ্ছে। বিষয়টি ভালভাবে বুঝার জন্য সে রনবীরের ফিরে আসা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত করল। কিন্তু ঝড়-বৃষ্টিতে

বাধ্য হয়ে তাকে মন্দিরের দিকে যেতে হল। বৃষ্টি থেমে গেলে আবার সে আগের জায়গায় ফিরে এলো। এক সময় রনবীর একজন সাপুড়েকে সঙ্গে নিয়ে শূলদের কুটিরে প্রবেশ করল। শংকর কুটিরের খুব কাছে গিয়ে ভিতরের লোকদের কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করল। কিন্তু ভাল করে কিছুই সে বুঝতে পারল না। কিন্তু রনবীর যখন বলল, "আমি এখন যাই।" তখন সে কথা শুনে শংকরের হতাশা বেড়ে গেল। সে মনে মনে চিন্তা করছিল যে, এতদূরি ছুটে গিয়ে রামদাস ও শহরের সিপাইদের সঙ্গে একে এনে রনবীরের 'অপকর্মটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু তা অসম্ভব। রনবীর বলল, "আমি কাল আবার আসব।" শুনে শংকর মনে আনন্দিত হয়ে উঠল। সে রনবীরের ঘোড়াটির পাশ দিয়ে মন্দিরে ফিরে যাচ্ছিল। ঠিক সে সময় রনবীর ও পাঁচু সেখানে পৌঁছে গেলে শংকর পালিয়ে গেল।

মন্দিরে গিয়ে শংকর দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়েই রইল। আগের মন্দিরে ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাকে জাগরণে কাটাতে হয়েছিল। দুপুর বেলা গোপাল তার গায়ে এক বাসতি পানি ঢেলে দিয়ে জাগিয়ে তোলে। শংকর রেগে উঠেই সামনে পুরোহিত ঠাকুরকে দেখতে পায়। তিনি বলেছিলেন, পূজা পাট নেই। মন্দিরে এভাবে ঘুমাচ্ছে। রাত্রিতে কি কর?"

পুরোহিত চলে যাবার পর শংকর মুখ হাত ধুয়ে খাবার খেয়ে নিল। তারপর শূল বস্তিতে গিয়ে রনবীরের খোঁজ করতে লাগল। মাধবদের ঘরের পাশে গিয়ে সে বুঝতে পারল রনবীর আসেনি। নিরাশ হয়ে ফিরে আসতেই তার বুকখানা খুশীতে দুশে উঠল। দেখল রনবীর ও মোহিনী এদিকেই আছেন। শংকর তৎক্ষণাৎ একটি গাছের আড়ালে আত্মগোপন করল। মোহিনী ও রনবীর কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছিল। শংকরও তাদের পেছনে পেছনে ঝোপের মাড়ালে আড়ালে পা টিপে টিপে এগিয়ে যেতে লাগল। মোহিনী ও রনবীর শূলদের কুটিরে প্রবেশ করল। শংকর এমনটি আশা করতে পারেনি। সে আরও নিকটে গিয়ে মোহিনীর গলার স্বর স্পষ্ট শুনতে পেল। মোহিনী দয়ালু কণ্ঠে বলল, "শান্তা! এখন কেমন আছ, বোন?"

শংকরের কানে যেন গলার গলানো সীসা প্রবেশ করল। সে দূত গতিতে শহরের দিকে ছুটল। পথে তার সঙ্গে পুরোহিতের দেখা হলে শংকর তাকে সব কথা বলল। তারপর দুজনেই উদ্বেগে নগরপতির বাড়ীর দিকে ছুটে চলল।

## বত্রিশ

বহুদিন পর মোহিনী কমলের ঘরে প্রবেশ করলে, কমল প্রথমে তাকে চিনতে পারল না। মাধব একবার মাত্র "মোহিনী" বলে সম্বোধন করেই নীরব হয়ে পেল। কী বলে তাকে অভ্যর্থনা জানানো উচিত, তা তার স্বরণ হল না। মোহিনী তার কুটির আসবে, এটা সে কখনই আশা করতে পারেনি। শান্তা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। ওদিকে মোহিনী এগিয়ে গিয়ে শান্তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলে, সে একটি খাড়িয়া এগিয়ে দিয়ে বলল, "মোহিনী দেবী! বসুন।"

মোহিনী রনবীরের ইচ্ছিতে সেখানে বসে পড়ল।

কমল রনবীরকে বলল, "তুমিও বস বাবা! এ মেয়েটি কে বলো।"

রনবীর বলল, "ওর নাম মোহিনী! ওর পিতার নাম অক্ষয়। সেবার শংকর যখন মাধবকে মেরেছিল, তখন এই মেয়েটিই আমার সঙ্গে ছিল।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে। সে সময় ও জেঁগে খুব ছোট ছিল। বড় ভাল মেয়ে। আমার মনে আছে, তার নিছের কাপড় দিয়ে সে মাধবের মাথায় পটি বেঁধে দিয়েছিল। কেমন আছ মা তুমি?"

মোহিনী বলল, "আমি ভালই আছি। শান্তার জন্য খুব দুঃখিন্তা ছিল। শান্তা তো ভাল আছে মনে হচ্ছে।"

সাপুড়ে নিকটেই বসে ছিল। উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলে উঠল, কেন ভাল হবে না? আমার মাধব চুল তো আর রোদে সাদা হয় নি।"

রনবীর বলল, "আপনার অনেক দয়া।"

সাপুড়ে বলল, "এখন আমি খোঁজ চাই, মহারাজ।"

"এত ভাড়াভাড়ি কেন মারেন? দু' একদিন থাকুন।"

"না, মহারাজ। বিপদের সময় অনেক লোক আমার কাছে ছুটে আসে। আমাকে না পেয়ে তারা ফিরে যাবে। মেয়েটি এখন বিপদ মুক্ত। আমাকে আজ্ঞা দিন।"

"তাহলে আমি বিক্রমে আপনাকে ঘোড়ায় করে পৌঁছে দেব।"

"পাঁচু বলছে, সে নাকি আমাকে পাখার পিঠে চড়িয়ে পৌঁছে দেবে।"

"তাই বুঝেছে? ঠিক আছে তাই হবে।"

বলে খুব-খুরাতেই রনবীর দেখতে পেল মাধব মোহিনীর দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে-জন চোখের ভাষায় দেবীর পদযুগলে অর্থ্য পেশ করছে। আর এ দিকে শান্তার

নন্দর রনবীরেরই দিকে। মোহিনী চোরা দৃষ্টিতে মাধবের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছে, মাধব অন্য কোনদিকেই চোখ ফিরায় না। মনের গভীর কোণে মাধবের মধুর ভালবাসার জ্বাবণ্ড উঁকি বুকি মারছে। সমাজের কঠোর শাসনের কথা অরণ করে সে নিজেকে দমন করারও চেষ্টা করছে। রনবীর ও শান্তার পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময়ও তাকে অস্থির করে তুলল। মোহিনী নিজেকে মাধবের আকর্ষণ থেকে মুক্ত রাখার জন্য রনবীরকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করার আশা পোষণ করতো। কিন্তু তার বুঝতে আর বাকী রইল না যে, ঐ ঢালটিই এখন শান্তার প্রেমে গলে তরল হয়ে পড়ছে। সে চঞ্চল হয়ে বলল, "ঢাল রনবীর, দেবী হয়ে যাচ্ছে।"

পাঁচুও তন্দ্রা হয়ে মোহিনীকে দেখছিল। মাধব রাতদিন পরিশ্রম করে যে তিনটি মূর্তি তৈরী করেছে, তা যে এ বাসিকারই প্রতিকৃতি, তা বুঝতে পাঁচুর কোনই অসুবিধা রইল না। মূর্তিগুলো ঘরের এক কোণে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। মোহিনী ও মাধবের চোখ মুখ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল যে, তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। তার মনেও মোহিনীর জন্য প্রেহের সঞ্চর হল। পাঁচু বলল, "তুমি আজ প্রথমবার পরীকের কুঁটরে এসেছ, মা! একটু খানি বস।"

রনবীরও সমর্থন করে বলল, "হ্যাঁ, একটু বস মোহিনী।"

রনবীর পাঁচুকে জিজ্ঞাসা করল, "মাধবের হাতের মূর্তিগুলো কোথায়? মোহিনীকে দেখাও তো। তুমি দেখবে না, মোহিনী?"

মোহিনী কোন উত্তর দিল না। ওদিকে পাঁচু মূর্তির উপর থেকে কাপড় সরিয়ে দিল। রনবীর বলল, "দেখলে মোহিনী! আদর্শ মূর্তি নিজের চেহারা দেখ। দেখতে পাবে হুবহু তুমিই যেন পাথরের রূপ ধারণ করেছে।"

সাপুড়েও কাছে গিয়ে বলল, "হ্যাঁ, এ মূর্তিগুলোতে প্রাণ দিতে পারলে, এগুলো দেখতে হুবহু আপনার মতই হয়ে উঠবে। চুল পরিমাণও এদিক সেদিক হবে না।"

প্রতিটি মূর্তির পার্শ্বের নিকটই ফুল সাজানো আছে। মোহিনীর চোখে অক্ষ দেখা দিল। সে হঠাৎ ঘর থেকে বের হয়ে গেল এবং নিকটবর্তী একটি গাছের সঙ্গে ঠেস দিয়ে নীড়িয়ে অশ্রুপাত করতে লাগল।

মাধব আর স্থির দাঁড়িয়ে পারল না। সে রনবীরের পা ছুঁয়ে বলল, "এবার আমাকে সাহায্য কর। মোহিনী অসহ্য হয়ে বের হয়ে গেছে। নিশ্চয় সে রাগ করেছে।"

রনবীর বলল, "তুমি মোটেই ডিম্বিত হনো না, মাধব! সে তোমার ওপর মোটেই রাগ করেনি। তুমি তাকে এখুনি ফিরিয়ে আনছি।"

রনবীর একথা বলেই ঘর থেকে দ্রুত বের হয়ে গেল এবং মোহিনীকে দেখতে পেয়ে নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাস করল, "মোহিনী! কি হল তোমার?"

মোহিনী চোখ মুছে মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার নিফল চেষ্টা করল। বলল, "কিছুই

হয়নি রনবীর। সত্য করে বল, তুমি আমাকে ঘৃণা কর না তো?”

“ঘৃণা? তা-ও তোমাকে? এ প্রশ্ন কেন করছ, মোহিনী?”

“রনবীর, তুমি তো জানো, মাধব যা কিছু করেছে তা আমার অজান্তেই করেছে। আমি তার সঙ্গে কখনো কোন কথা বলিনি। তুমি আমাকে নিশ্চয়ই নির্দোষ মনে কর?”

“মোহিনী! মাধব তোমাকে ভালবাসে। মানুষ দেবতাকে যেমনভাবে ভালবাসে, মাধব তোমাকে তেমনিভাবেই ভালবাসে। বরং দেবতার চাইতেও বেশী ভালবাসে। আমি প্রেমের ক্ষেত্রে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ করার পক্ষপাতী নই। শ্রম-জাত-ধর্ম মানে না। কাল শাস্তা আমার জন্য নিজের জীবন দান করতে প্রস্তুত হয়েছিল। সমাজ আমাকে এদের ঘৃণা করতে শিখিয়েছে। কিন্তু মানবতা তাদের ভালবাসিতে শিক্ষা দেয়। আমি শাস্তার মনে আঘাত দেয়া মহাপাপ মনে করি। তোমার জন্মের যদি আমি হতাম, তাহলে কিছুতেই আমি মাধবকে ঘৃণা করতে পারতাম না। মোহিনী! সত্য করে বলো মাধবকে তুমি ভালবাস না?”

মোহিনী আবার চোখ মুছে বলল, “রনবীর! একথা আমাকে জিজ্ঞেস করো না। আমি নারী, অবলা। একটি নির্দিষ্ট গভীর বাইরে যাবার শক্তি আমার নেই।

“মোহিনী! আমি তোমাকে সাহায্য করব। শুধু আমি জানতে চাই, তুমি মাধবকে ভালবাস কি না?”

“ভালবাসা কি কতু তা আমি জানি না রনবীর! আমি শুধু এইকু জানি যে, তাকে ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা বলে আমি আশ্রম নিয়ে খেলা করতেও রাগী নই। কলকে ও অপমানের চাইতে মৃত্যুকেই আমি প্রের মনে করি। মাতাপিতার সম্বন্ধ নষ্ট করার বদলে আমি আশ্রমহত্যা করাই ভাল মনে করি।”

রনবীর মোহিনীর কীধে অসুখ চাখে বলল, “তোমার সামনে বাধা-বিপত্তির পাহাড় রয়েছে, একথা আমি জানি। কিন্তু সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে গেলে দুনিয়ার কোন বাধাই অপরাধের নয়। আমি তোমাকে এ বিষয়ে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করব। তুমি সাহস সঞ্চয় কর। মনকে শক্ত কর। সমাজের এ মিথ্যা ভেদনীতির প্রাচীর তুমি ভেঙ্গে দাও। সত্য ও ন্যায়ের দ্বয় অনিবার্য।”

মোহিনী কিছু মুগ্ধ হইয়াছিল, হঠাৎ নিকটের রোপ থেকে রামদাস বের হয়ে এসে রনবীরের দিকে চাফা করে বলে উঠল, “সাবাশ রনবীর! তাহলে তোমার এতদূর অধঃপতন হয়েছে!”

পেছল-সুইনে অর্জুনকে বের হয়ে আসতে দেখে মোহিনী চীৎকার নিয়ে অজ্ঞান হয়ে মুগ্ধ হইয়া পড়ে গেল। রনবীর তাকে উঠাবার জন্য এগিয়ে এসে, অর্জুন তার হাত বন্ধে অর্জুনে ঠেসে দিয়ে বলে উঠল, “যাও, সরে যাও। ওকে মরতে দাও।”

রামদাস মোহিনীকে ভুলে ধরে বলল, “অর্জুন! মোহিনীর কোন দোষ নেই। সকল

দোষ রনবীরের। সে নিজেও গোপনায় গিয়েছে, মোহিনীকেও নরকে টেনে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।”

মোহিনীর জ্ঞান ফিরলে ঝোপের ভিতর থেকে শংকর ও পুরোহিত বের হয়ে এলো। মোহিনী কিছু বলতে গেল। রামদাস বাধা দিয়ে বলল, “কোন কথা বলো না, মোহিনী! আমরা তোমাদের সকল কথাই শুনেছি। তুমি শংকরের সঙ্গে বাড়ী যাও। শংকরের দিকে তাকিয়ে বললেন, “মোহিনীকে বাড়ী পৌঁছে দাও। আর খবরদার কেউ যেন এ বিষয়ে কিছুই শুনতে না পায়।”

ঝোপের ভিতর থেকে আরও দুজন লোক বের হয়ে এসে রামদাসের ইঙ্গিতে রনবীরের দু’হাত বেঁধে ফেলল। রামদাস পুরোহিতকে লক্ষ্য করে বলল, “পুরোহিত ঠাকুর! আমাদের মান-সম্মত এখন আপনারই হাতে।”

পুরোহিত বলল, “এসব ঘটনা কেউ জানতে পারবে না। আমরা নিশ্চিত থাকব।”

রামদাস রনবীরের দিকে তাকিয়ে বলল, “কল তুমি শংকরের জন্যে গিয়েছিলে। এক মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করনি যে, তোমার পিতা নারীহত।” অর্জুনকে লক্ষ্য করে বলল, অর্জুন! আমি খুবই লজ্জিত। এখন আমার দায়িত্ব করা সম্ভব সব কিছুই করব। মোহিনীর বয়সই বা কত? সরলা বাসিকার কোন দোষ নেই। এসবই রনবীরের কারণসিদ্ধি। চল, বাড়ী যাই। সবই ঠিক ঠাক করা হবে।”

পাঁচু সাপুড়েকে পৌঁছে দিতে গিয়েছে। মন্দির ঘরে বসে মনের চাকল্য দমন করতে পারছে না। মোহিনী তার কুটির থেকে বের হ’য়ে যাবার পর তার মনে দুর্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। মোহিনী রাগ করে চলে গেল কিনা, তাও সে বুঝতে পারছে না। উচ্চ জাতের লোকদের মূর্তি তৈরী করা পাপ-কিন্দা, তা তাঁর জ্ঞান নেই। যদি পাপ হয়ে থাকে তাহলে রনবীর নিশ্চয়ই মাধবকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিত। কারণ যাই হোক না কেন, মোহিনী খুশী হয়ে ফেরত একথা স্পষ্ট। মোহিনীর সঙ্গে তার দেখা হবে সে আশা সুদূর পরাহত। এখন তার কি করা উচিত? মাধব ভাবল, মোহিনীর মূর্তি গড়তে গিয়ে ভগবানকে সে কৃপা পিয়েছিল। সেজন্যই হয়ত ভগবান মোহিনীকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন। মাধব ভগবানের কাছে আরঞ্জী পেশ করার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে দীরে দীরে মন্দির কাছে একটি ঝোপের ভিতরে প্রবেশ করল এবং ঢেঁচের জলে বুক ভাসিয়ে ভজন পাইতে শুরু করল। ঠিক এমনি সময় ঝোপের ভিতর থেকে হঠাৎ শংকর বের হ’য়ে এসে ধমকে উঠে বলল, এই কুকুর! তুই তোমার অপবিত্র মুখে ভগবানের নাম উচ্চারণ করছিস কোন্ সাহসে?

শংকরের চোখমুখে ত্রোদধের ছাপ দেখে মাধব ঘাবড়ে গেল। তার কণ্ঠের গানও থেমে গেল। শংকর বলল, “চল তোকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।”

দেখতে দেখতে মুহূর্তের মধ্যে লাঠি ও কুঠার হাতে আরও কয়েকজন লোক পাশে



এসে দাঁড়াল। মাধব এটাকেও ভগবানেরই ইচ্ছা মনে করে চুপচাপ তাদের নির্দেশিত পথে হাঁটতে শুরু করল। কিছুদূর যাবার পর পেছন থেকে একজন ডেকে বলল, "ঠাকুরজী! ধীরে ধীরে চলুন। এই ভারী জিনিসগুলো নিয়ে হাঁটতে বড় কষ্ট হচ্ছে।"

মাধব পেছন ফিরে দেখতে গেল কয়েকজন সিপাই তার তৈরী করা সেই মূর্তিগুলো কাঁধে করে বয়ে নিয়ে আসছে। মাধব বলল, "ওগুলো আমার তৈরী জিনিস। তোমরা নিয়ে যাচ্ছ কেন?"

শংকর রাগে গজ্জন করে উঠল, "পাপিষ্ঠ, নরোধম! ফের মিছে কথা বলছিস? এ মূর্তিগুলো তুই আমাদের মন্দির থেকে চুরি করে আনিস নি?"

"আমি কায়স্থ জিনিস চুরি করি না।"

শংকর আবার ধমকে উঠলেন, "মুখ বন্ধ কর দুরাচারী, নইলে হাত খুলে ফেলব।"

মাধব আর কিছু বলতে সাহস করল না। নীরবে সে পথ চলতে লাগল।

### তৃতীয়

পথে রনবীর কয়েকবার পিতার নিকটে কিছু বলার চেষ্টা করল। কিন্তু রামদাসের ক্রোধ দেখে কিছু বলার তার সাহস ছিল না। বাড়ীর সদর দরজায় শংকর দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, "মোহিনীকে বাড়ী ফেরা দিয়েছি, মহারাজ! আর কোন আদেশ?"

রামদাস বলল, "ঠিক আছে। এখন তুমি যাও।"

রামদাস রনবীরের দিকে তাকাল। রনবীর বলল, "পিতাজী! তার কোন সোধ নেই। সে শূন্য নয়। তার উপর কোন অত্যাচারই আমি হ'তে দেব না।"

রামদাস রাগে মাটি পড়ল। রনবীরের গালে সজোরে চপেটাঘাত করে তার চুল ধরে টেনে সে তারই বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল এবং ক্রোধাক্ত হয়ে তীষণ প্রহার করতে লাগল। রনবীর স্তম্ভ হৈর্ষ সহকারে পিতার হাতে মার খেতে লাগল। তার পৌরবর্ণ পাসের উপর কাঁচুলের পুরু ছাপ পড়ে গেল। তার ঠোঁট ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়তে দেখে রামদাসের মন নরম হয়ে এলো রামদাস বলল, "তুমি তাকে ব্রাহ্মণ মনে কর নাকি? তার উপর অত্যাচার হ'তে দেবে না। নির্লজ্জ অসৎ পাঁজি কোথাকার!"

রনবীর বলল, "পিতাজী! আমি সত্য কথা বলছি।"

“চূপ করে থাক অসত্য।” রামদাস গর্জন করে উঠল। সে রনবীরের হাত ধরে ভিতরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, “চল, আমার সঙ্গে।”

রনবীর অগত্যা পিতার সঙ্গে যেতে লাগল। রামদাস তাকে বাড়ীর একটি কুঠরীতে ঠেলে দিয়ে বাইরের দিক থেকে দরজার শিকল টেনে দিয়ে বলল, “তুমি এখন এখানেই থাকবে।”

রনবীর ঠিৎকার করে বলতে লাগল, “পিতাঙ্গী! আমার একটি কথা শুনুন। সে কোন মতেই শূদ্র নয়। সে আপনার বন্ধু সুখদেবের সন্তান। আমি সত্য কথাই বলছি। আপনি শুনুন—

রামদাসের কানে ঠিৎকার পৌঁছল না। রামদাস ততক্ষণে অন্ধের মূর্ছে চলে গিয়েছে।

সন্ধ্যার কিছু আগে রামদাসের বাড়ীর সামনে লোকজনের দিড়িটি জটলা দেখা গেল। একটি বিশাল বটপাছ। পাছের গোড়াটি চারিদিকে বৃত্তাকার একটি বেদী দিয়ে ঘেরা। ঐ বেদীর উপরে মাধবের তৈরী করা মূর্তিগুলো সজ্জিত রয়েছে। দর্শকেরা তক্তি গদগদ হয়ে মূর্তিগুলোর সামনে টাকা পয়সা ও ফুল রেখে মুগ্ধ শহরের উত্তর দিকে অবস্থিত কালী মন্দিরে আজ্ঞা আনন্দোৎসব। রামদাসের অন্ধ মন্দিরের পূজারীগণ মোহ বসিদান করেই সমুদ্র থাকত। আজ বহুদিন পরে নরবলির এক সুযোগ আসার কারণে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ বেজায় খুশী।

রামদাস নরবলির পক্ষপাতী নয়। তার ইচ্ছা, মোহিনী ও মাধবের মেলামেশা জনিত কলংক চাপা দেয়ার জন্য ছেলেটিকে এ দুইজনা থেকে বিতাড়িত করে দেওয়া। কিন্তু কে জানতো যে, তার ঘরে মন্দির থেকে মূর্তি করা তিন তিনটি মূর্তি পাওয়া হবে! কে জানতো যে, শহরের আট জন পুস্কানী ব্যক্তি মাধবকে ভজন গাইবার সময় হাতে নাতে ধরে ফেলবে! এসব ছদ্মকথাপের দরুন মাধবকে তারী শক্তি থেকে রক্ষা করার কোনই উপায় নেই। রামদাস, তা নগরপতি, স্বয়ং মহারাজা হলেও, সমাজের সকল লোককে নারাজ করে কেউ কিছু করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই ব্রাহ্মণেরা যখন এক বাক্যে মাধবের জন্য কালী মন্দিরে বসিদানের দস্ত ঘোষণা করল, রামদাস তখন নীরবতা অবলম্বন করে হাত পা ত্যাগের দেখল না। সে মনে মনে দুঃখ করে বলল, “বড়ই আফসোস! আমার ছেলেটির জীবন রক্ষা করতে পারছি না। এখন তাড়াতাড়ি বসিদান সম্পন্ন হলেই ভাল। বসিদান শেষ হ'বার আগে রনবীরকে মুক্তি দেয়া সম্ভব নয়। সে মাধবকে রক্ষা করার জন্য নিজেকে অবশ্যই বিপদে নিচ্ছেপ করবে।”

এক জটিল একটি অসুবিধা দেখা গেল। কালী মন্দিরের পুরোহিত নদীর ওপারে একটি কুঠরীতে গেছে। জনগণের চাপে রামদাস পুরোহিতকে নিয়ে আসার জন্য নৌকো পাঠিয়েছে। পুরোহিতের জন্যই এখন যা কিছু বিলম্ব

## চৌত্রিশ

শহরের সিপাইগণ মাধবকে তালাশ করতে এসে কমলের ঘর থেকে তিনটি মূর্তি নিয়ে যায়। স্ত্রীলোকদের প্রতি কোন দুর্ব্যবহার না করার জন্য রামদাস সিপাইদের কড়া নির্দেশ দিয়েছিল। সিপাইগণ তাই শাস্তা ও কমলকে কিছুমাত্রে জিজ্ঞাসাবাদও করেনি। শংকরও তাদের সঙ্গে ছিল। সিপাইদের উপস্থিতিতে তার কিছু করার সাহস ছিল না। তাই নিজেকে সামলে নিয়ে সে নীরবেই চলে গিয়েছিল। কিন্তু তার নিজের মনের কুবুদ্ধি তাকে অবশেষে অধির করে তুলল।

কমল মাধবকে তালাশ করার জন্য ঘিলের চারুধারে বৃষ্টি সুরাফেরা শুরু করল। কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। তাই ক্রমেই তার উদ্বেগ বেড়ে চলল। ক্রমে রাত হয়ে এলো। শাস্তা ঘরের সামনে খাড়িয়ায় বসেছিল। মাধব আর মায়ের জন্য তার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। হঠাৎ সে মানুষের পায়ে শব্দ শুনতে পেয়ে "মা, মা!" বলে চিৎকার করে উঠল। কে একজন পুরুষ কণ্ঠে বলে উঠল, "তোমার মা ঘরে নেই?"

শাস্তা দৃষ্টি ফিরিয়ে মশাল হাতে একজন পুরুষকে দেখতে পেয়ে ভয়ে কীপতে কীপতে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?"

"চূপ করে থাক। সাবধান! গোলমাল করবি না।" বলতে বলতে লোকটি এগিয়ে গিয়ে খড়ের ঘরে ঢালের ওপর আগুন জ্বাণিয়ে দিল। শুকনো খড়ে আগুন লেগে চোখের নিমিষে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

শাস্তা অসহায়ভাবে ঘর পেত্রির এই দৃশ্য দেখতে লাগল। শংকর হাতের মশাল ফেলে দিয়ে এসে শাস্তার হাত ধরে বলল, "তোমার ভয় নেই। তুমি আমার সঙ্গে এসো। তুমি আমার সেবাদাসী হয়ে থাকবে চল।"

শাস্তা এক টানে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কয়েক কদম পেছনে সরে গেল।

শংকর বলল, "শুভ্রানীর আবার এত গরিমা কেন!"

শাস্তা কিছু না বলে ক্রমে ক্রমে পেছনে সরে যেতে লাগল। শংকর পুনরায় এগিয়ে এসে তার কাছখানি চেপে ধরল। শাস্তা এবার শংকরের গালে সজোরে একটি চড় বসিয়ে দিল। শংকর শাস্তার হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের গালে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "তোমার সেই ফুলের যত হাত দু'খানা চড় মারার জন্য তৈরী হয়নি। ও হাত তো চুমো

খাবারজন্যে।”

শান্তা ছুটে গিয়ে খাটটার উপর থেকে তরবারি উঠিয়ে নিল এবং তরবারির তীক্ষ্ণ আগাটি শংকরের বুকের দিকে সোজা করে ধরে বলল, “নিলর্ড পানীঠ! সামনের দিকে আর এক পা বাড়ালে এ তরবারি সোজা তোমার বুকে ঢুকিয়ে দেব।”

শংকর ভয়ে পেছনে হটতে শুরু করলে শান্তা সামনের দিকে এগুতে লাগল। কীপতে কীপতে শংকর হ্রীচট খেয়ে টিং হয়ে পড়ে গেল। পড়েই জুলন্ত আগুনের বেড়ার সঙ্গে সে এমনভাবে ধাক্কা খেল যে, তার জোখ মুখ সব ঝলসে গেল। শান্তা বলল, “এই বীরত্ব নিয়ে দুর্বলদের উপর অত্যাচার করতে এসেছিলি পাখিয়ে যা নিলর্ড কুকুর!”

শংকর উঠে পেছনদিক ঘুরে ছুটে পালিয়ে বাঁচল। ততক্ষণে ঘাত্ত বনের চারদিকে বহুলোক জমা হয়ে গিয়েছে। শান্তা বলল, “আমি আগে যদি বুঝতে পারতাম, পুজারী ঠাকুর এতটা ভীত, তাহলে তো আগেই তার কাছ থেকে মশালটা ছিনিয়ে নিতে পারতাম।”

### পঁয়ত্রিশ

কিছুক্ষণ পর কমল ঘরে ফিরে এসে শান্তা ‘মা, মা’ বলে কেঁদে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, “আমি যা ভুল করেছি, মা! ঘরে তো তরবারি ছিলই। যদি আগে থেকে গুটা ব্যবহার করতাম, তাহলে পুজারীটা বাড়িঘর জ্বালিয়ে নিতে পারত না।”

কমল শান্তাকে জব্বা দিগ্বা বলল, “গুটা কিছু নয় বাছ! আমার কাছে মাধবের চেয়ে বাড়ি ঘরের মূল্য বেশি নয়। মাধবকে সিপাইরা ধরে নিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।”

যারা গুথানে গিয়েছিল, তাদের উদ্দেশ্যে কমল বলল, “তোমরা আমাদের চিনতে পারোনি বোধহয়। আমি তোমাদের অনেককেই জানি। তোমাদের সাধন সরদার আমার পিতা। যাত্রা কড়ি বছর আগে আমার পিতাকে হত্যা করেছিল, তারাই আজ আমার একমাত্র শত্রু মাধবকে ধরে নিয়ে গেছে। তারা আমার পিতাকে যেভাবে হত্যা করেছে, তিক্ত ভাবেই আমার সন্তানকেও হয়ত মেরে ফেলবে! তোমাদের মধ্য থেকে কে কে আমাদের সাহায্য করতে পার। আমার পুত্রের জীবন রক্ষা কর।”

লোকজন পরস্পরের সঙ্গে কলাবসি করতে শুরু করল, “সাধন সরদারের কন্যা!

কমল!"

কমল বলল, "হ্যাঁ, আমিই কমল। তোমরা সুখদেবকে নিচয় ভুলে যাওনি। তিনিই আমার স্বামী।"

কয়েকজন বুড়ো এগিয়ে এলো! একজনের মাথার সব চুল পাকা। জিজ্ঞেস করল, "কমল! তুমি আমাকে চিনতে পারছ মা?"

"কি করে তোমাকে ভুলে যাব, তেজু কাকা! আমি যখন ছোট ছিলাম, তুমিই তো আমাকে কাঁধে করে নিয়ে বেড়াতে। একদিন তুমি আম গাছের নীচে ঘুমিয়ে ছিলে। আমি তোমার ঠোঁট ফাঁক করে তাতে পাকা আমের রস নিংড়ে দিয়েছিলাম। বল তো, তোমাকে চিনতে পেরেছি কী না, তেজু কাকা?"

অশ্রুসজল কণ্ঠে তেজু বলল, "হ্যাঁ, মা! তখন তো আমরা বাসিন্দা ছিলাম। এখন সে আনন্দের দিন আর নেই মা।"

কমল বলল, "কাকা, মাথবের খোঁজ করা।"

তেজু বলল, "কমল, তুমি আমাদের সরদারের কন্যা। তোমার আদেশে আমরা যমের সঙ্গে লড়াইতে প্রস্তুত। কিন্তু আমরা নিরস্ত্র, অসহায়। আমরা আজ নানা মতে বিভক্ত। সরদারের মৃত্যুর পর আমরা পারসেড়ে লুকিয়ে কিছুকাল লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর রামদাস একদিন নিরস্ত্র অবস্থায় আমাদের নিকটে এসে আমাদের সঙ্গে সন্ধাবহারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে গেছে। আমাদের তার কথা বিশ্বাস না করে গভীর জংগলে চলে গেছে। আজ তারা স্বাধীন। রামদাস অবশি আমাদের সঙ্গে কোন দুর্ভাবহার করেনি। কিন্তু শহরের বাসিন্দারা আজ আমাদের নীচ মনে করে ঘৃণা করে। তাদের শহরে আমরা যেতে পারি না। তাদের ঘনিরে আমরা পূজা করতে পারি না। তগবান ছোট জাতের লোকদের ডাক দিইনি। এদিকে ফসলের জমি ও বাস করার বাড়ী পেয়ে আমরা মনের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছি। যারা রামদাসের বশ্যতা স্বীকার না করে গভীর বনে চলে গিয়েছিল তারা এমন উর্বরা জমি পায়নি। আজও তারা পাতার ছাওয়া জরাজীর্ণ কুটির বসবাস করে। কিন্তু তারা স্বাধীন। তারা শহরের লোকদের তুচ্ছ জ্ঞান করে। আগের দিনের মত জাতের লোকেরা অত্যাচার করে আমাদের দুর্বল করতে পারেনি। রামদাস আমাদের শক্তি হরণ করে নিয়েছে। অবশ্য একথা সত্য যে, দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের পত্নীতে এরা কোন অত্যাচারও করেনি। আজ তাদের হঠাৎ আক্রমণ থেকে মুক্তি যাচ্ছে যে, এরা সাধন সরদারের কন্যা এখানে আসার খবর জানতে পেরেছে। সুখবস্ত' একলাই সরদারের নাতিকে তারা ধরে নিয়ে গেছে।"

কমল বলল, "আর কেউ জানে না। সরদারের পুত্র আমাদের ঘরে এসেছিল। সে মাথবের পিতার আংটি দেখে আমাদের পরিচয় জানতে পেরেছে।"

স্বামী তাড়াতাড়ি করে বলল, "না মা! রনবীর আমাদের সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করবেনা।"

তেজু বলল, “ভূমি এদের জ্ঞান না। এরা বহু দূর থেকেই তাদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর জিনিসগুলো অনুমান করে নিতে পারে। আমিও রনবীরকে কয়েকবার দেখেছি। চেহারা-সুরতে তাকে নরম স্বভাবের লোক বলেই মনে হয়। কিন্তু চেহারা-সুরত দেখে কোন মানুষ সম্পর্কে মতামত পোষণ করা ঠিক নয়। এদের গায়ের চামড়া খুবই মোলায়েম। কিন্তু ঐ চামড়ার নীচে পাথরের তৈরী অন্তর চাপা থাকে।”

শান্তা বলল, “কিন্তু সে তো রামদাসের পুত্র। ভূমি তো নিজেই রামদাসের প্রশংসা করছিলে।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, রামদাস সত্যই ভাল মানুষ। কিন্তু সে আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় ব্যবহার করে তা-ও উঁচু জাতের স্বার্থেই। আমাদের দাস বানিয়ে রাখার জন্য আগে হাজার হাজার সৈন্য মোতায়েন করে রাজা-মহারাজাগণ চেষ্টা করেছে। সফল হতে পারেনি। আর আজ রামদাসের মধুর ব্যবহারের দরুন মাত্র দেড়-দুশ্রী সৈন্য আমাদের বাধা অনুপাত করে রেখেছে। তারা আমাদের হুকুম দেয়, শহরে এসে না। আমরা তখন শহর থেকে বহু দূরে থাকি। ঐ শহরের প্রতিটি মহলের নীচে আমাদেরই ঘরের ছাই চাপা পড়ে আছে। যদি আমরা আমাদের ছেড়ে আসা কৃপণভাবে চেকে জল আনতে যাই কিংবা ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করি, তখনো কি রামদাস আমাদের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করবে? রামদাসের অনুমতি ছাড়া তোমাদের ঘর-দুপালিয়ে দেয়া কিংবা মাথবকে প্রেক্ষতার করা কিছুতেই সম্ভব হয় নি।

শান্তা নীরব হয়ে গেল। তার মন তেজুর মুহুর্তে সায় দিল না।

কমল বলল, “এখন কি করব? তারা আমাদেরকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলবে।”

তেজু বলল, “মাথবকে উদ্ধার করার জন্য আমি জীবন দিতে রাজী। তবে কয়জন লোক আমার সঙ্গে থাকবে তা আমি বলতে পারছি না।”

পাঁচ জয় জয় একসঙ্গে বলে উঠল, “আমরাও তোমার সঙ্গে প্রাণ দিতে প্রস্তুত।”

কমল ভাল করে চেয়ে দেখল। ওরা সবাই তেজুরই মত বুদ্ধ। তার বাপের পুরাতন সঙ্গী। যুবকদের চেহারাও খাঁড়ির চিহ্ন। তারা শহরবাসীদের বিরুদ্ধে কোন কিছু চিন্তা করাও পাশ মনে করে। তাদের সন্তানের এবং বোনেরা তাইদের হাত ধরে টেনে নিয়ে নিজ নিজ বাড়ীর দিকে চলে গেল। কমলের ঘরের সামনে রইল ছয়জন বৃদ্ধ এবং তেজুর পৌত্র চৌদ্দ বছর বয়সের বালক লালু।

কমল বলল, “সবাই পালাচ্ছে। আমি তো তাদের বৃদ্ধ করতে বলিনি।”

লালু এগিয়ে এসে বলল, “আমি মাথবের জন্য লড়বো। শহরবাসীদের আমি মোটেই পরোয়া করিনা।”

কমল একটুখানি ছেলের কথা শুনে বিস্মিত হল। বলল, “না বাছা! ভূমি ছোট ছেলো-ভূমি বাড়ী যাও।” তেজুকে বলল, “কাকা, ভূমি শান্তাকে তোমার বাড়ীতে নিয়ে

যাও। আমিই শহরে যাচ্ছি। রামদাস আমাদেরকে রাজার কারাগার থেকে উদ্ধার করে জীবন রক্ষা করেছিল। তা-না হলে পরের দিন ভোর বেলায় আমাদের বলিদান হয়ে যেতো। আজও আমাদের পরিচয় পেলে সে নিশ্চয়ই মাধবের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে আসবে।”

তেজু বলল, “কমল! রামদাসের বাড়ী শহরের মাঝখানে। তোমার পক্ষে সেখানে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না। শহরের তল্ল লোকেরা তোমাকে কিছুতেই রাজপথে হাঁটতে দেবে না। আর যদি কোন উপায়ে সেখানে যেতেও পার তাহলে রামদাসের সদর দরজায় দাঁড়ানো সিপাই তোমাকে ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দেবে। সুখের পরিবর্তে ইট ব্যবহার করাও তাদের পক্ষে বিচিত্র নয়। তাছাড়া শহরের সদর দরজাও এখন বন্ধ। আমি বরং লালুকে পাঠাচ্ছি। সে মাধবের খোঁজ করবে। আর প্রয়োজন হলে সে সাহায্যও করতে পারবে।”

“কে সে লালু?”

“লালু আমার নাজী। এই যে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে।”

“এ কিশোর ছেলে সেখানে গিয়ে কি করতে পারবে, ককা?”

“তুমি তাকে জান না, কমল! শহরের কোন বাড়ীই তার অচেনা নয়। সে সব জায়গায় যায়। তাকে কেউ কিছু বলে না। রাত্রির শহরের প্রাচীর উপক্কে সে ভিতরে ঢোকে। ওদের ঘরে ঢুকে খাবার দাবার এবং অন্যান্য জিনিস পত্রাদি নিয়ে আসে। তার পায়ের রং তল্ললোকদেরই মত। ওদেরই ঘর থেকে চুরি করা কাপড় পরে সে দিনের বেলায় শহরে ঘুরে বেড়ায়। সে ওদের মনিরেও যেতে পারে। লালু রাত্রির মধ্যেই মাধবের খোঁজ করতে পারবে। সবকিছু হলে সে তাকে শহর থেকে বের করে আনবে। তুমি এখন আমার বাড়ীতে চলে। কোর বেলা লালু তোমার জন্য অবশ্যই কোন সুখবর নিয়ে আসবে।”

তেজুর বাড়ীতে যাওয়া হাফু কমল অন্য কোন উপায় খুঁজে পেল না। বলল, “আমার তো সবই পেছে। একমাত্র এ মাটিরাটি অবশিষ্ট আছে। চল, এটি হাতে করে তোমার বাড়ীতেই আশ্রয় নিই, ককা।”

শান্তা লালুকে এক পার্শে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, “লালু! তুমি শহরের সমস্ত বাড়ী চেন?”

লালু বলল, “হ্যাঁ চিনি, কোন বাড়ীই আমার অচেনা নাই।”

“রনবারের বাড়ী চেন?”

“হ্যাঁ চিনি।”

“রনবারকে চেন?”

“তাকেও চিনি, বহবার দেখেছি।”

"লালু! তুমি আমার ভাই। আমার জন্য একটি কাজ করবে মানিক?"

লালু খুশী হয়ে বলল, "নিশ্চয় করব। কি কাজ তুমি বল।"

"তুমি রনবীরের বাড়ীতে গিয়ে তাকে গোপনে বলবে, সাপের বিষে শান্তার অবস্থা আবার খারাপ হয়ে গেছে। মরণের আগে সে একবার তোমাকে দেখতে চায়। আর এ আংটিটি তুমি তার হাতে দিও।"

লালু আংটি হাতে নিয়ে বলল, "অমনি বাড়ীতে গিয়ে কাপড় বদল করে একুশি শহরে যাচ্ছি।"

"তোমাকে আমি রোজ দুধ আর মাখন দেব, ভাইটি আমার।"

"উহঁ! দুধ-মাখন আমি পছন্দ করি না। আমার পছন্দ বড় গোপালের বাড়ীর পিঠা।" বলেই সে হাসতে হাসতে ছুট দিল।

## ছত্রিশ

শূন্যের বস্তিতে লালু সকলের নিকটই পরিচিত। সে অত্যন্ত চালাক ও নিষ্ঠুর ছিলে। দৌড়, সীতার আর গাছে চক্কর প্রতিযোগিতায় তাকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। দুই বুকের দরুন সকলের মুখে মুখে তার মাম। জংগলের হিংস্র জহু ও শহরের তন্ত্র সমাজ কোনটিকেই সন্তোষ করে না। একদিন সকলে শুনে পেল লালু জংগল থেকে ভাঙুরের ছানা বহে এনেছে। পরের দিন হয়ত শোনা পেল সে শহরের কোন ভদ্রলোকের পোশাক চুরি করে এনেছে অথবা প্রহরারত তন্ত্রাঙ্কর সিপাহীর বন্দুক কেড়ে এনেছে।

শৈশবেই তার মা-দাদা মারা যায়। তেজু অনাথ পৌত্রকে মানুষ করার বহু চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। মারিত্তি করেও কোন লাভ হয়নি। অবশেষে তাকে সে নিজের ইচ্ছামত চলার স্বাধীনতা দেয়ার কল্যাণকর বিবেচনা করেছে।

প্রথম প্রথম রাত্রিবেলা লালু শহরে ঘুরে-বেড়াতে। আজকাল দিনেই সেখানে অবাধে চলাফেরা করে। তার গায়ের রং পৌর বর্ণ। সন্ত সমাজের পোশাক চুরি করে এনে সে জড়ো করে রেখেছে। সেসব কাপড় ছোপড় পরে শহরে গেলে কেউ তাকে শূন্য বলে ধারণা করতে পারে না। তন্ত্র সমাজের কণ্ঠবার্তা ও চাল চলন সে নিখুঁতভাবে রঙ করে দিয়েছে। মন্দিরে যাতায়াত করে পূজা পার্বনের সকল রীতি নীতিও সে শিখে ফেলেছে।



রাত্রি তৃতীয় প্রহরে লালু শহরে প্রবেশ করল। রামদাসের বাড়ীর সদর দরজায় পাহারাদার দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে বসে ঘুমাচ্ছে। লালু একটি পাছে চড়ে নিঃশব্দে ছাদের উপর নেমে গেল। সেখানে রামদাস একা নিদ্রিত। পাশে রনবীরের খাটটি শূন্য পড়ে আছে। লালু নীচে নেমে এক জায়গায় কয়েকজন তৃতাকে ঘুমুতে দেখল। সেখানেও সে রনবীরকে খুঁজল কিন্তু তাকে নিরাশ হ'তে হল। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। দিনের আলোতেই খোঁজ করতে হবে ভেবে সে কিছু খেয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিল। একটি পরিচিত পাছের স্মিট আম তাকে টেনে নিয়ে গেল। এক বাড়ীর ছাদের উপর দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ সে বাড়ীর ভিতর থেকে এক যুবতীর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল। যুবতী ফুপিয়ে ফুপিয়ে কঁদছে আর বলছে, "মা! ইশরের দোহাই! আমাকে ছেড়ে দাও। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। ঐ মানুষটি মূর্তি চুরি করেনি। তাদের নষ্ট যাওয়ার অপরাধ আমার। সে অন্য তার শাস্তি হ'তে পারে না। আমরা কোন অপরাধও করিনি। শাস্তা রনবীরের জীবন রক্ষা করেছিল, তাই আমরা তাকে সেবাতে বধ্য করেছিলাম।"

মা বলল, "মোহিনী! বাপের মুখে আর কলংকের কাশি নাগিয়ে দিলেন। যদি কেউ শুনে ফেলে তখন কি হবে বল তো?"

"মা, আমাকে ছেড়ে দাও। যদি তাকে বলি দেয়া হয়, তাহলে আমি নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করব।"

"আমার নুনের মর্যাদা রক্ষা কর, পোড়ার মুখ! মন্দিরে গিয়ে সকলের সামনে তুই এসব কথা বলবি। আর তোর বাবার মাথা হেঁচকি হ'তে যাবে।"

"তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বল, মা! বাবা তো আমার কথা শুনে।"

"না, তোর বাবা ঐ শূনের বাচ্চাকে মন্দিরে বলি দেয়ার শপথ নিয়েছেন।"

"তাহলে আমাকে রনবীরের পিতার কাছে যেতে দাও। যদি তিনি জানতে পারেন যে, মাধবের বোনই রনবীরের জীবন রক্ষা করেছে, তাহলে তিনি অবশ্যই তার জীবন রক্ষা করবেন।"

"মোহিনী! চূপ কর। রনবীরের বাবাকে নিজেই সব কথা বলতে পারবে।"

"মা, তুমি নিজেই তো বসন্তে রনবীরকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সে বেচারি তো জানেই না যে, মাধবকে চূপ করে এনেছে।"

"আমার সামনে তুই বারবার ঐ কুকুরের বাচ্চার নাম বলবি না। কেউ শুনলে আমাদের মান-সন্ত্রম চুরি যাবে।"

"আমি সে জিনিস মোটেই পরোয়া করি না। যদি তাকে বলি দেয়া হয়, তাহলে আমি ছাদের উপর থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করব। সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। মা, গর্গবানের দোহাই। তাকে দাঁড়াও। আমি আর কোনদিন ঝিলের ওপার যাব না।"

অনেকক্ষণ পর্যন্ত যুবতীর কান্নার শব্দ শোনা গেল।

এ হৃদয়বিচলন শোনার পর লালু ফুখা তুলে গেল। সে মন্দিরের দিকে এগুতে শুরু করল। পথে সে শংকরকে রামদাসের বাড়ীর দিকে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করল,

“পূজারী ঠাকুর! তোমার মুখ পুড়ে গেল কী করে?”

শংকর রেগে উঠে বলল, “তাতে তোমার কি দরকার?”

লালু মন্দিরে গিয়ে মাথবকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় দেবী মূর্তির সামনে পড়ে থাকতে দেখল। মোহিনীর পিতা অর্জুন এবং আরো পনরজন সৈনিক তাকে পাহারা দিচ্ছে। লালু কালক্ষেপ না করে পুনরায় রামদাসের বাড়ী দিকে দৌড় দিল। ভীতকণ্ঠে সবাই জেগে উঠেছে। এদিকে অনেক লোকজন রামদাসের বাড়ীতে আসতে শুরু করেছে। লালুও সরাসরি বাড়ীতে ঢুকে পড়ল এবং একটি বিশাল কামরায় শহরের অনেক গণ্যমান্য লোকদের জটলা করে বসে থাকতে দেখল। তারা বলিদান সম্পর্কেই আলোচনা করছে। লালু রনবীরকে ডালাশ করল। একটি কামরার দরজায় জনৈক সৈনিককে দাঁড়ানো দেখেই সে বুঝতে পারল, রনবীরকে সেখানেই বন্দী করে রাখা হয়েছে। লালু সৈনিককে বলল, “নগরপতি তোমাকে ডেকেছেন।” সৈনিক লালুর কথা শুনে নগরপতির সঙ্গে দেখা করতে চলে গেল।

লালু দরজার নিকটে গিয়ে বলল, “শোন, রনবীর।”

“কে তুমি?”

“পরিচয়ের এখন দরকার নেই। আজ কালী মন্দিরে মাথবকে বলি দেয়া হচ্ছে। শাস্তা আমাকে পাঠিয়েছে। সাপের বিষ তার শরীরে পুনরায় ত্রিন্দা শুরু করেছে। মৃত্যুর আগে সে তোমাকে একবার দেখতে চায়। শাস্তা তোমাকে দেয়ার জন্য একটি আর্ঘট নিয়েছিল। আমি তা কপাটের নীচ দিয়ে ঠেলে দিচ্ছি।”

রনবীর বলল, “শোন। আর্ঘট আমাকে দেয়ার দরকার নেই। আমার বাবাকে আর্ঘটটি পৌঁছে দিয়ে বল, এটা তার বড়ুর স্মৃতিস্মরণ আর্ঘটতে যার নাম লেখা রয়েছে তিনিই মাথবেরপিতা।”

পাহারাদার বিরক্ত হয়ে কিরে এসে। এদিকে লালুও গুহের আড়ালে আড়ালে সরে পড়ল। রামদাসের কামরায় ভীষণ ঠাণ্ড। একজন লোক বলল, “মহারাজ! পুরোহিত ঠাকুর পৌঁছে গেছেন। সব কিছু প্রস্তুত। শুধু আপনার জন্যে প্রতীক্ষা করা হচ্ছে।”

রামদাস বলল, “আপনার মান। আমি এঁকুনি আসছি।”

লোকজন চলে গেলে রামদাস এক ব্যক্তিকে হাতের ইশারায় কাছে ডেকে বলল, “গোপাল। আমি হয়ত শুকানে নাও যেতে পারি। এ নিষ্ঠুর দৃশ্য আমি দাঁড়িয়ে দেখতে পারব বলে মনে হয় না। আমার জন্যে বেশী সময় অপেক্ষা না করে বলিদান সমাঙ্গ করে ফেলবে।”

গোপাল দরজা পর্যন্ত গিয়ে কিরে এসে বলল, “মহারাজ! আপনি ছেলেটিকে দেখেন নি। দেখতে দেখতে সুখদেবের মত।”

“কী বললে সুখদেবের মত?”

“হ্যাঁ, মহারাজ।” বলেই গোপাল বাড়ী থেকে বের হয়ে গেল। রামদাস কামরায় পায়চারি করতে লাগল।

লালু সুযোগ বুঝে সেই কামরার প্রবেশ করল। সে আংটিটি রামদাসের হাতে তুলে দিয়ে বলল, “মহারাজ! এই আংটিটি—”

রামদাস আংটিটি তাকের উপর তুলে রেখে বলল, “এখন যাও, পরে দেখব।”

সে সাহস করে বলল, “মহারাজ! ঐ আংটিটি আপনার বন্ধুর।”

রামদাস বলল, “ঠিক আছে। যার আংটি তাকে আমি পৌঁছে দেব। এখন বিরক্ত করো না, যাও।”

লালু শেষ বারের মত সাহস সঞ্চয় করে আবার বলল, “মহারাজ—  
“চলে যাও বলছি, কে আছে?”

লালু নিরাশ হয়ে বের হয়ে গেল এবং ব্যারান্দায় গিয়ে একটি স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়িয়ে কী করা যায় চিন্তা করতে লাগল।

ঠিক ঐ সময় একটি লোক চীৎকার করতে করতে ব্যস্তিত চুকল, “মহারাজ! সর্বনাশ হয়েছে। একজন শূদ্র শহরে ঢুকে পড়েছে।”

রামদাস কামরা থেকে বের হয়ে জিজ্ঞেস করল, “কি হয়েছে?”

লোকটি বলল, “মহারাজ! একজন শূদ্র তরবারি হাতে শহরে ঢুকেছে। সিপাই তাকে বাধা দিলে সে সিপাইদের আঘাত করেছে। সিপাইরা তাকে আঘাত করেছে। সে আহত হয়ে এদিকেই ছুটে আসছে। বলছে, সে নাকি নগরপতির সঙ্গে দেখা করতে চায়।

লালু দেখতে পেল, পাঁচু একটি রক্তমাখা তরবারি হাতে এদিকেই আসছে। তার পা কীপছে। বুক থেকে রক্তের ধারা বয়ে চলেছে।

রামদাস একখানি তরবারি হাতে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বলল, “তুমি কে? ওখানেই দাঁড়াও।”

পাঁচু কথা না বলে হাতের ইশারায় বলল যে, সে লড়তে আসেনি। নগরপতির নিকট শুধু ফরিয়াদ জানাতে এসেছে।

রামদাস বলল, “তুমি কেন এ বেশে এখানে এসেছো?”

পাঁচুর রক্তাক্ত গাট কিছটা ফাঁক হল। সে বলল, “তুমিই কি রামদাস?”

“হ্যাঁ, আমিই রামদাস বল, কি বলতে চাও।”

“মাধবকে তুমি কেন মাধব সুন্দেবের পুত্র। আর সে কথা রনবীরও জানে। তুমি মাধবকে বীচাও।”

কয়েকবার “বীচাও, বীচাও” বলার পর তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠে এলো। পাঁচু মাটিতে পড়ে গেল। সে অজ্ঞান অবস্থায় কেবল “বীচাও, বীচাও” বলতে লাগল। তার চোখ দুটি রামদাসের মুখের দিকে স্থির নিবদ্ধ রইল।

রামদাস অস্থির হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে রনবীরের কামরার তালা খুলে তাকে বের করে আনল।

রনবীর রাগত স্বরে বলল, “বাবা! তোমার কলজে ঠাণ্ডা হয়েছে তো? এর নামই কি ন্যায় বিচার? সমাজের আইন ভঙ্গ করেছে তোমার পুত্র, আর বলিদান হচ্ছে এক

নিরপরাধ ব্যক্তির। শত শত বছর ধরে নির্দোষ মানুষের রক্ত তোমার ধর্মের কপালে কলংক টিকা হয়ে লেটে আছে। তুমি কি তারই পুনরাবৃত্তি করলে?”

রামদাস বলল, “রনবীর! উত্তেজিত হলো না। আমার সঙ্গে এসো।”

রনবীর পিতার পেছন পেছন হেঁটে পাঁচুর মৃতদেহের নিকটে পৌঁছল। তার মাথা খুঁজে গেল। চোখের কোন থেকে তার ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। পিতার দিকে তাকিয়ে সে বলল, “বাবা! এ তোমার দ্বিতীয় বিজয়। আমি এই স্নেহটিকে খুব ভাল করে জানি।”

রনবীর পাঁচুর হাত থেকে তরবারিটি তুলে নিয়ে এসে পিতার হাতে তুলে দিয়ে বলল, “বাবা! এটা মাধবের পিতা ও তোমার বছর দ্বিতীয় নিদর্শন। আংটি তো আগেই দেখেছো।”

“রামদাস বিম্বিত মুখে বলল, কোন আংটি?”

লালু ছুটে নিয়ে কামরা থেকে আংটিটি তুলে নিয়ে এসে বলল, “মহারাজ! আমি এটি আপনার হাতে দিয়েছিলাম। আপনি এটিকে তাকের গুপের মধ্যে দিয়েছিলেন।”

রামদাস রনবীরের মুখের দিকে সপ্রাণ দৃষ্টিতে তাকাল। রনবীর বলল, বাবা! আংটিটিতে সুখনেবের এবং তরবারিতে তোমার নাম লেখা রয়েছে, দেখ।”

রামদাস কীপতে লাগল। কম্পিত রামদাসের হাত থেকে তরবারি ও আংটিটি মাটিতে পড়ে গেল। সে বলে উঠল, “হায় ভগবান! এটাও কি সম্ভব?” বলেই সে রনবীরকে জিজ্ঞেস করল, “তুমি কি ভাল করে জান, মাধব সুখনেবের সন্তান?”

“বাবা! এখন সে কথা শুনে আর কি হইবে। কাল রাতে আমাকে কথা বলার সুযোগ দাওনি। এখন তো যা হবার ছিল, তা হয়েই গেল।”

রামদাস বলল, “না, না, এখনও কিছু হয়নি। ছেলেটি এখনো জীবিত আছে। আমি তাকে বাঁচাতে পারি। অবশ্যই তাকে বাঁচাতে হবে।”

রামদাস আশ্রাবলের দিকে ছুটে গেল। রনবীর তরবারিটি এবং লালু আংটিটি তুলে নিয়ে পেছন পেছন ছুটল। রামদাস ও রনবীর দু’টি খোড়ায় চড়ে তীরের গতিতে মন্দিরের দিকে রওনা হল। লালু এক লাফে খোড়ার উঠে রনবীরকে জড়িয়ে ধরে খোড়ায় শিঁটে বসে রইল।

## সইত্রিশ

কালী মন্দিরের পুরোহিত হাত জোড় করে দেবী-মূর্তির সামনে দাড়িয়ে আছে। মাধবের হাত পা দড়ি নিয়ে বেঁধে তাকে হাঁটু গেড়ে দেবীর সামনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। জনৈক পূজারী একটি চক্চকে খড়গ উঠিয়ে মাধবের ঘাড়ে কোপ দেয়ার জন্য তৈরী

হয়ে দাড়িয়ে আছে। মাধবের চেহারা তয়-ভীতির লেশমাত্র নেই। বরং পরিপূর্ণ স্বৈর্য সহকারে সে দেবমূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে শান্ত দৃষ্টি। প্রতি মুহূর্তেই সে দুনিয়ার এ অজ্ঞানময় আবাসস্থল ছেড়ে ভগবানের নিকটে পৌঁছে যাওয়ার জন্য আকৃতি জানাচ্ছে। মোহিনীর কথা মনে উদয় হলে ঋণিকের জন্য তার চিন্ত-চাক্ষু উপস্থিত হয় কিন্তু পরক্ষণেই সে মনে মনে ভাবে, মোহিনী তার লক্ষ্য নয়। সে ছিল লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপলক্ষ মাত্র। তার মাধ্যমেই মাধব ভগবানকে জানতে পেরেছে। এখন স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে সে মিশে যাচ্ছে। মোহিনী সেখানে অপ্রয়োজনীয়। ভগবান যদি তাকে রক্ষা করেন, তাহলে দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে হত্যা করতে পারবে না। আর তিনিই যদি তার এভাবে মরণ পছন্দ করে থাকেন, তাহলে দুঃখ করার বেশ কারণ নেই।

পুরোহিত উচ্চৈঃস্বরে তজন সঙ্গীত গাইতে শুরু করল। মন্দিরে উপস্থিত জনতা কালাসেবীর জয় ঘোষণা করে ধ্বনি দিল। পূজারী ঠাকুর কোণে কোণে জয় খড়গ উপর দিকে তুলে ধরল। মাধব মরণের এ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে পারবে না। মনে করে চোখ বন্ধ করল। ঠিক সেই সময় লালু মন্দিরে প্রবেশ করে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলল, "ধামো, ধামো, স্বয়ং মহারাজ আসছেন।"

পুরোহিতের গলার স্বর মাঝপথে স্তব্ধ হয়ে গেল। পূজারী ঠাকুরের খড়গও গেল ধেমে। সকলে দরজার দিকে তাকাল। ততক্ষণে রামদাস মন্দিরের ভিতরে পৌঁছে গেছে। রনবীর তার পেছনেই আসছিল। রামদাস কিছু ঠেলে মূর্তির নিকটে পৌঁছে মাধবকে অক্ষত অবস্থায় দেখতে পেয়ে ঘোষণা করল, "আজ আর বলিদান হবে না। তোমরা নিজে নিজে বাড়ীতে ফিরে যাও।"

হঠাৎ বজ্রপাত হলেও লোকের এতটা অবাক হতো না। তারা একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। কালা মন্দিরের পুরোহিত বলল, "মহারাজ! বলির সমস্ত অনুষ্ঠানই সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন তো বলিদান বন্ধ করা যায় না। এটা করার অধিকার আপনার আমার কাছে নেই।"

"অত্যাচার বন্ধ করার অধিকার সব সময়ই আমার আছে।" বলতে বলতে রামদাস তরবারির সাহায্যে মাধবের হাত পায়ের বন্ধন কেটে দিতে শুরু করল।

কালা মন্দিরের পুরোহিত কিছুটা নমে গেল। শহরের প্রধান পুরোহিত এগিয়ে গিয়ে বলল, "মহারাজ! আপনি এসব কি করছেন? এতে যে ধর্মের অবমাননা হচ্ছে!"

রামদাস বন্ধন কাটা অব্যাহত রেখে বলল, "ধর্মের মান ইচ্ছত জুলুম করে বাড়ানো যায় না পুরোহিত মুশায়, বরং ন্যায় বিচারের মধ্যেই ধর্ম।"

পুরোহিত বলল, "মহারাজ! জুলুম কোথায় হল? সে যে তজন সঙ্গীত পেরেছিল, আটজন সঙ্গীত ব্যক্তি তার সাক্ষী আছেন। সে মন্দির থেকে মূর্তি চুরি করেছে। ব্রাহ্মণদের পঙ্কায়িত যখন তার দণ্ড বিধান করেন, তখন আপনিও তাদের সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। আর এখন এভাবে আপনি দেব-মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করছেন?"

অর্জুন অগ্রসর হয়ে বলল, "দেবীর অপমান সহ্য করা হবে না। বলিদান অবশ্যই হবে।"

জনতা চেঁচিয়ে বলল, "বলিদান হতেই হবে। অবশ্যই হবে।"

রামদাস মাথবের সকল বর্ধন কেটে শেষ করে দিল। এবার সোজা হয়ে দাড়িয়ে অর্জুনকে লক্ষ্য করে বলল, "অর্জুন! তুমি তো জান যে, এ ছেলের কোন দোষ নেই। সে মূর্তি চুরি করে নি। তুমি ভালো করেই জান, এসব কার মূর্তি? আমি তোমার মান সম্রম রক্ষার খাতিরে তো জুলুম করতে পারি না।"

অর্জুন এবার দৃষ্টি অবনত করল। কিন্তু জনতা আগের মতই চেঁচামেচি করে বলতে লাগল, "বলিদান হতেই হবে।"

শহরের জনৈক প্রবীণ ব্রাহ্মণ রাজ্যের প্রধান পুরোহিতের আত্মীয়। সে এগিয়ে এসে বলল, "মহারাজ! ধর্মীয় ব্যাপারে আপনার হস্তক্ষেপ খুবই অন্যান্য। আপনি তাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবেন না। যদি জোর করেন তাহলে আমরা সকলে মিলে রাজ দরবারে যাবো।"

রামদাস বলল, "ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে আমি কখনো ভয় করি না। আমি জানতে পেরেছি, মূর্তিগুলো ছেলেটি নিজেই তৈরী করেছে। চুরি করেনি।"

"আপনার নিকট কোন প্রমাণ আছে?"

"প্রমাণ রনবীর, সেই সব কিছু বলবে।"

রনবীর এগিয়ে এসে বলল, "ঝিলের পারে শবে মূর্তি তৈরী করার সময় আমি নিজের চোখে তাকে পাথর কাটতে দেখেছি।"

একজন প্রশ্ন করল, "তখন গাওয়া?"

রামদাস বলল, "যারা তার বিরুদ্ধে তখন সঙ্গীতের অভিযোগ তুলেছে তাদের একজনকেও আমি বিশ্বাসযোগ্য মনে করি না। রনবীর, ওকে নিয়ে যাও।"

ব্রাহ্মণ এত সহজে পরাজয় স্বীকার করে নিতে রাজী হন না। তাই সে জনতাকে ফেপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা নিতে শুরু করল। ফলে অর্ধেকেরও বেশী সংখ্যক লোক পুরোহিতের পক্ষ সমর্থন করে চিৎকার করতে লাগল।

শহরের প্রধান পুরোহিত বলল, "মহারাজ! এ ব্যক্তি দোষী কি নির্দোষ সে বিষয়ে এখন আলোচনার কোন অর্থকশ নেই। বলিদানের দণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে। মন্দিরে বলিদানের জন্য বেলায় অনুষ্ঠান প্রয়োজন, তা সবই সম্পন্ন হয়েছে। এখন এ বলিদান কিছুতেই বন্ধ হবে পারে না।"

ক্ষত্রিয়দেরও ব্রাহ্মণের সমর্থন করতে দেখে রামদাস বলল, "আম্বা, তাই হবে। বলিদান অবশ্যই হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে কাশী দেবী ও মহারাজের জয় ধ্বনিতে মন্দির কেঁপে উঠল।

রামদাস হাতের ইশারায় জনতাকে ধাক্কা দিয়ে দিল। বলল, "কিন্তু বলিদান তার হবে না—প্রাণী হতে হবে।"

সেক্ষম একসঙ্গে প্রশ্ন করল, "আপনার?"

হ্যাঁ, আমাকে তোমরা বলি দাও।" বলতে বলতে রামদাস হঠাৎ গেড়ে দেবী মূর্তির সামনে বসে ঘাড় নীচু করে দিল। পুনরায় বলল, "যদি বলিদান এতই আবশ্যিক হয়ে থাকে, তাহলে আমি গর্দান পেতে দিচ্ছি। পুরোহিত ঠাকুর! আপনি সব উপায়ের সন্ধন করেছেন। আপনার পুজারীকে আমার গর্দান কেটে ফেলার আদেশ দেবীর মন রক্ষার্থে আমি নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত। কিন্তু এক নিরপরাধ ব্যক্তি রক্তপাত করে আমি দেবীর চরণে জলুমের উপহার পেশ করতে অক্ষম।"

ব্রহ্মগণ স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। ক্রিয়গণ মুহূর্তে রামদাসের পক্ষে চলে গেল। অক্ষয় নিজেই রামদাসের হাত ধরে তাকে দাড়ি করিয়ে দিল। রামদাস পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে বলল, "কি পুরোহিত ঠাকুর! থেমে গেলেন যে?"

মন্দিরের হাত ধরে নিয়ে রামদাস মন্দির থেকে বের হলে, মন্দির কেউ তার পথরোধ করার সাহস পেল না। মন্দিরের বাইরে এসে রামদাস বলল, "মাধব! মুখদেব কোথায়?"

মাধব বলল, "বহুদিন আগে আমার বাবা মারা গেছেন।"

"তোমার মায়ের নাম কমল নয়?"

"হ্যাঁ" মাধব মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

রামদাস বলল, "এক্ষণি তুমি বাড়ী চলে যাও, তোমার মা এবং বোনকে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি পাহাড়ের দিকে চলে যাবে। বৃষ্টি সম্ভব উত্তেজিত জনতা তোমাদের বাড়ীতে আক্রমণ করবে। ঐ যে সামনে পাহাড় দেখতে পাচ্ছ, তার অপর দিকে একটি শরণা আছে। সেখানে আমার জন্য তেঁর অপেক্ষা করো, আমি যথাসময়ে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাব।"

বৃহত্তা জ্ঞাপনের দৃষ্টিতে একবার রামদাসের মুখের দিকে তাকিয়েই মাধব বাড়ীর দিকে ছুটে লাগল। রমবীর বলল, "বাবা! তুমি অনুমতি দিলে, আমিও একবার গভান থেকে ঘুরে আসতে চাই।"

রামদাস মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, "মাধবের বোনের কি যেন নাম?"

"শান্তা।"

"রামদাস মুহূর্তে খানিক চিন্তা করে বলল, এখন তোমার সেখানে যাওয়া সম্ভব মনে হচ্ছে না। তুমি বরং শান্তার সঙ্গে এসো।"

"কিন্তু বাবা, শান্তা যে মরণের মুখে।"

"কি হয়েছে তার?"

রমবীর কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মন্দির থেকে হৈ চৈ করে কয়েকজন ব্রাহ্মণকে বের হতে দেখে রামদাস তাড়াতাড়ি বলল, "ঠিক আছে, যাও। কিন্তু শান্তার অবস্থা খারাপ হলে আমাকে খবর দিও।"

রমবীর ছুটে গিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হল। লালু ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি

শহরে যাচ্ছেন?"

"না, আমি অন্য জায়গায় যাচ্ছি।"

লালু ঘোড়ার সামনে দাড়িয়ে বলল, "জানি, আপনি শান্তাকে দেখতে যাচ্ছেন। কিন্তু সে নিজের ঘরে নেই। আমাকে সঙ্গে নিন। সে কোথায় আছে, আমি জানি।"

"তাহলে আমার পেছনে বসো। কিন্তু তুমি কে? শান্তাকেই বা তুমি কি করে চিনলে? তুমি তার কাছ থেকে কি করে আণ্ট নিয়ে এসেছিলে?"

লালু প্রশ্নগুলোর জবাব না দিয়ে একলাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল এবং ঘোড়া যখন তীর বেগে দৌড়াতে শুরু করল, তখন বলল, "আপনাকে আমি একটা সুসংবাদ দিতেচাই।"

"এ সময় আমার কাছে কোন সংবাদই সুসংবাদ নয়। কিন্তু তুমি যা বলতে চাচ্ছ, শীঘ্র করে বলে ফ্যালো।"

"শান্তা সম্পূর্ণ সুস্থ আছে।"

রনবীরের অন্তর আনন্দে নেচে উঠল। ঘোড়ার লাগাম টেনে সে মুখ কিরিয়ে বলল, "সত্যি কথা বলছ?"

"আমি তখন আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছিলাম।"

"তুমি সেখানে কখন গিয়েছিলে?"

"আমি সেখানেই তো থাকি।"

"তুমি শহরের বাসিন্দা নও?"

"না।"

"তুমি ফরিয় নও?"

"না।"

"তবে তোমার পরিচয় কি?"

"পরিচয় যদি বলি, আপনি আমাকে নির্ধাৎ ঘোড়া থেকে নীচে ফেলে দেবেন।"

"কেন?"

"কারণ আমি একজন পুত্র।"

"তোমার বেশভূষা দেখে তো তা মনে হয় না।"

"আপনাদের দয়াকরে সবহয়েছে।"

"তোমার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। তোমার মুখের ভাষাও শহরের লোকদেরই মত।"

"ভাষা না শুধিবে আপনাদের শহর ও মন্দিরে যুরে বেড়ানো সম্ভবপর হতো না।"

"তোমাকে খুব সাহসী মানুষ মনে হয়।" একথা বলে রনবীর পুনরায় ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

ঝিল্লির নিকটে পৌঁছে রনবীর দেখল, মাধব বাড়ীর দিকে ছুটছে। রনবীর ঘোড়া ধামিয়ে মাধবের সাথে করমর্দন করল। মাধব লালুকে বলল, "পাঁচু কাকার মৃত্যুর খবর



এখন কারুর কাছে খবরদার প্রকাশ করো না।”

“ঠিক আছে।”

## আটত্রিশ

বিকানের পড়ন্ত রোদে রামদাস ও রনবীর বাড়ীর সামনে একটি বটগাছের নীচে বসেছিল। রনবীর মাথব ও শান্তার সঙ্গে তার পরিচয়ের কাহিনী পিতার নিকট শবিত্তারে বলে শেষ করল। রামদাস সব শুনে জিজ্ঞেস করল, “সত্যই কি শান্তা খুব ভালো মেয়ে?”

“বাবা—”, বলে রনবীর দৃষ্টি নত করল।

রামদাস আবার বলল, “সুখদেব ও কমলের মেয়ে অবশ্যই ভালো মানুষ হবে। কিন্তু সত্যি কি তুমি তাকে ভালবাস রনবীর?”

রনবীর দৃষ্টি নত রেখেই বলল, “বাবা! আমি তাকে ছাড়া বেঁচে থাকার কোনই প্রয়োজন বোধ করি না।”

“তবে দেখ। সুখদেবের মত তোমাকেও সারা জীবন কাটা বিছানো পথে চলতে হবে। এ সুন্দর শহর, এসব আরামদায়ক বাড়ীঘর, সব ছেড়ে তোমাকে বনজংগলে জীবন কাটাতে হবে।”

“বাবা! আমি সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত।”

“যদি আমি তোমাকে ঐ বালিকার ভালবাসা ভুলে যেতে আদেশ দেই?”

“বাবা, তাহলে আমি কখনো, আপনি নিজ হাতে আমার গলা টিপে মেয়ে ফেলছেন।”

“এতক্ষণে গুরা অনেক দূর চলে গিয়েছে বলে আমার মনে হয়।”

“হ্যাঁ, বাবা!”

“শান্তা এখন সুস্থ হয়েছে কি?”

“ঐ ছেলেটি মিথ্যা কথা বলেছিল। শান্তা ভালই আছে।”

“ছেলেটি কে?”

রনবীর লাগু সম্পর্কে যা যা জানতো, সবই তার পিতার নিকট বলল। রামদাস জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা, মোহিনী কি সত্যই মাথবকে ভালবাসে?”

“আমার তো তা—ই বিশ্বাস, বাবা!”

“মোহিনী কি জানে যে, মাথব সুখদেবের পুত্র?”

“সম্ভবতঃ জানে না।”

রামদাস পুনরায় চিন্তায় ডুবে পেল। ঠিক ঐ সময় মোহিনী ত্রস্তপদে বাড়ীতে প্রবেশ করল এবং রামদাসের নিকটে এসে বলল, “কাকা বাবু! আপনি মাধবকে রক্ষা করুন। বাবা অনেক লোকজন নিয়ে গুদের বাড়ীতে আক্রমণ করার জন্য রওনা হচ্ছেন। শহরের ব্রাহ্মণেরা সবাই আমাদের বাড়ীতে জড়ো হয়েছে।”

রামদাস ইচ্ছা করেই কিছুটা বেপরোয়া ভাব দেখাল। বলল, “আমি তার কি করতে পারি?” [www.banglabookpdf.blogspot.com](http://www.banglabookpdf.blogspot.com)

“কাকা বাবু! আপনি নগরপতি! বাবাকে আপনি নিবেদন করতে পারেন। ব্রাহ্মণেরা যদি তার বাড়ীতে চড়াও হয়ে তাকে পিটিয়ে হত্যা করে, তাহলে তাকে আপনি কি জন্য উদ্ধার করবেন?”

“মোহিনী! সে জন্য তোমার এত চিন্তার কারণ নেই। তার জাম্পো যা লেখা আছে তা কে খণ্ডন করতে পারে?”

মোহিনী নিরাশ হয়ে রনবীরকে বলল, “রনবীর! ওরা আমাদের জীবন পুড়িয়ে মারবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তুমি তাকে রক্ষা কর।”

রনবীরকে নিশ্চিত দেখে মোহিনী বলল, “ও, তাহলে তোমার সব কিছুই ছিল অস্তিনয়। তোমাদের অন্তরও তাদেরই মত কুটিল। তুমি কাপুরুষ!” বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে অশ্রু পড়িয়ে পড়ল। রামদাস তার কাছে উঠে এসে কাঁধের উপর হাত রেখে বলল, “বাহা! একজন শূদ্র তরুণের জন্য তুমি এত চিন্তা করছ, কেন?”

মোহিনী ফুপিয়ে কেঁসে উঠল এবং বলল, “কাকা বাবু! আমি জানতাম না যে, আপনিও বাবারই মত শূদ্রদেরকে মানুষ মনে করেন না।”

“মোহিনী! আমিও জানতাম না যে, তুমি তাকে এতই ভালবাস। আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব।”

“সে নিরপরাধ, এমন্য আমি শুধু তার জীবন রক্ষার জন্য অস্থির।”

“এখন তার জীবন নাশের কোন আশংকা নেই। সে অনেক দূর চলে গেছে।”

“অনেক দূর, কোথায়?”

“পাহাড়ে।”

মোহিনীর মুখ মডসে একটা সসে আনন্দ ও বিশ্বাসের ছায়াপাত হল। অন্তর একবার খুশীতে নেচে উঠে পুনরায় স্তব্ধ হয়ে পেল। চোখের দীপ্তি একবার জ্বলে উঠে আবার নিতে পেল। সে কৃতান্ত ব্যক্তি হয়ে বলল, “তাহলে আপনি তাকে নির্বাসন দিয়েছেন কাকা বাবু?”

“হ্যাঁ, বাছা! তার জীবন রক্ষার খাতিরেই তাকে অনেক দূরে পাঠিয়ে দেয়ার পরিকার ছিল।”

“কোথায় পাঠিয়েছেন, কাকা বাবু?”

“যেখানে শহরের কেউ পৌছতে পারবে না।”

মোহিনীর দুই চোখে অশ্রু চল নেমে এলো।

রামদাস বলল, "সে তো এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ, তারপরও তুমি কীদছ?"  
মোহিনী রামদাসের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রনবীরকে জিজ্ঞেস করল, "তার মা এবং শাস্তাও কি তার সঙ্গেই গেছে?"

রামদাস বলল, "হ্যাঁ, তারাও তার সঙ্গেই রয়েছে। রনবীরও তাদের নিকটই চলে যাবে। সে শাস্তার জন্য আমাদের ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

মোহিনী হঠাৎ রামদাসের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। অপ্রসন্ন কণ্ঠে বলে উঠল, "কাকা বাবু! আমিও রনবীরের সঙ্গে যাব। আমিও মাধবের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। মাধবকে না পেলে আমার জীবনের কোনই মূল্য নেই।"

রামদাস তাকে হাত ধরে তুলল। বলল, "কিছু তোমার মাতা-বিত্তা রয়েছে। তুমি কি তাদের ত্যাগ করতে পারবে?"

"আমি তো আগেই বলেছি। দুনিয়ার সব কিছুই আমি তার জন্য ত্যাগ করতে পারব।"

"সমাজ কি বলবে?"

"আমি সমাজের কোন পরোয়া করি না, কাকা বাবু! তাকে না পেলে আমি জলে ডুবে মরব, না হয় পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করব।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে তুমিই জরী হয়েছে। এরপর তাহলে তৈরী হয়ে নাও। তোমাদের অনেক দূর যেতে হবে। বাইরে খুব অন্ধকার। সে পাহাড়টির চূড়ায় একটি বড় বটগাছ রয়েছে, সেখানে পৌঁছে আমার জন্য তোমারা অপেক্ষা করো। তোমাদের জন্য ঘোড়া তৈরী আছে।"

মোহিনী কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে রামদাসের দিকে তাকাল। তার চোখে তখন অশ্রুর বন্যা।

## উনচল্লিশ

শুভে শুভে রামদাসের অনেক রাত হয়ে গেল। এতক্ষণ ছাদের উপর সে পায়চারি করছিল। তার চোখে কিছুতেই ঘুম আসছে না। তার সমগ্র অন্তর আজ শূন্য। বিশাল বাড়ীটি খাঁ খাঁ করছে। দশ বছর আগে রনবীরের মা ইহলোক ত্যাগ করার পর থেকে রামদাস রনবীরকে অবলম্বন করেই বেঁচে ছিল। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত রনবীরের ক্রমপরিণামশীল দৈহিক গঠনের প্রতিটি ছবি তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছিল। নিশ্চয় রনবীর যেদিন তার কোলে বসে পৌঁফ ধরে টানতো, হাতের আঙ্গুল মুখে পুরে

দাঁত দিয়ে কামড়ে দিত, সেদিন রামদাস কোন ব্যথা অনুভব করতো না। বরং তার কাছে গুর দুইমিটাই ভালো লাগতো। সে পরম যত্ন সহকারে ঐ দুঃস্থ শিশুকে খোড়-সওয়ারী, তীরন্দাজী ও অসি চালনা শিক্ষা দিয়েছিল। কিশোর রনবীরের প্রতিটি কথা রামদাসের নিকট অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ ছিল। তার চেহারায় ছিল রাজাধিরাজের বিক্রম আর দেবতাদের পবিত্রতা। দিনমানের কয়েকবার রামদাসের মুখ থেকে "আমার বাবা, আমার রনবীর" শব্দগুলি উচ্চারিত হত।

রনবীরের মা মোহিনীর মায়েয় বাস্ববী ছিল। অর্জুন রামদাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই অর্জুন ও সাবিত্রী রনবীরকে প্রাণ ভরে গ্ৰেহ করতো। তারা রনবীর ও মোহিনীকে নিয়ে ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল স্বপ্ন সৌধ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সব কিছুই গুলট পালট করে দিল। রামদাস রনবীর ও শান্তার প্রেমের স্বর শুনে খুব রেগে গিয়েছিল। ধারণা করেছিল হুমকি-ধমকি ও কঠোরতার মাধ্যমে এ অব্যাহিত প্রেমের ছেদ টানা যাবে। কিন্তু মাধব ও শান্তার প্রকৃত পরিচয় জ্ঞান করার পর রামদাস আবার সমাজের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠল। আজ তাই সে রনবীর ও মোহিনীকে বিদায় করে দিল।

ভূত্য অজ্যাস মাফিক আজও রামদাসের পাশেই রনবীরের বিছানা পেতে দিয়েছে। রামদাস রনবীরের শূন্য বিছানা থেকে বালিশটি উঠিয়ে নিয়ে নিজের বুকে চেপে ধরল। যে চোখে বহু বছর যাবৎ অশ্রু দেখা যায়নি, আজ তা সজল হয়ে উঠল। সে ব্যথিত স্বরে বলল, "রনবীর! বাছা আমার! আজ বন্দের মধ্যে ভূমি কিতাবে রাত কটাছ জানি না, হয়ত বা পাথরের উপরেই তোমাকে ঘুতে হয়েছে -। আর আমি -।"

রামদাস উঠে বসল। ছানের ওপর বসায় সে পাথরটা শুরু করল। মাঝ রাত্রে একবার ভূত্যকে ডেকে বলল, "আমার খোড়া তৈরী কর।"

ভূত্য এসে বলল, "মহারাজ! আপনার খোড়া তৈরী করা হয়েছে। অর্জুন মহারাজ আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য খোড়া লাড়িয়ে আছেন।"

রামদাস বলল, "তাকে ওপরে নিয়ে এসে।" বলেই খাটের ওপর সে বসে পড়ল।

অর্জুন ওপরে এসেই বলল, "মহারাজ! মোহিনী আজ সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বের হয়েছিল। এখন তাকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রনবীর কোথায়?"

রামদাস উত্তর দিল, "রনবীর তো এখানে নেই। ভূমি বস অর্জুন।"

"আমি বসতে পারছি না। আমার মনে খুবই অশান্তি। রনবীর কোন সময় বাইরে গিয়েছে?"

"অর্জুন, ভূমি বস। আমি তোমাকে কতকগুলো কথা বলতে চাই।"

অর্জুন প্রশ্ন করল, "আপনি কি মোহিনী সম্পর্কে কিছু জানেন?"

"হ্যাঁ, বলছি তো, বস।"

অর্জুন বসে পড়ল। রামদাস অর্জুনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "সুখদেবের কথা কেবল মনে পড়ে অর্জুন?"

আমি সুখদেবকে কি ভুলতে পারি? কিন্তু মোহিনীর ব্যাপারে সে প্রসঙ্গ কেন?"

অর্জুন। রনবীর আর মোহিনী আমাদের পরিত্যাগ করে চলে গেছে।"

অর্জুন সহসা দাড়িয়ে গেল। সে রামদাসের শেষের কথাগুলো তোতা পাখীর মত

আবশ্যি করল, "আমাদের পরিত্যাগ করে চলে গেছে!"

হ্যাঁ, চলে গেছে। রনবীর সুখদেবের কন্যার জন্য আর মোহিনী গিয়েছে সুখদেবের

পুত্রের জন্য।"

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম। ভগবানের দোহাই! আমাকে সব কথা আপনি

বুঝিয়েছেন।"

আমি সত্য কথাই বলছি, অর্জুন।"

তা কি করে হয়? সুখদেব তো এক অশুভ পুত্র বালিকাকে

অর্জুনকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রামদাস বলল, "হ্যাঁ সে পুত্র বালিকাকে বিয়ে

করেছিল। সেই বালিকার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্ম হয়। সুখদেব আজ

ইহলোকপতে নেই। তার স্ত্রী-পুত্র তাদের পরিচয় গোপন করে ঝিলের ওপারেই বাস

করাছিল এতদিন। রনবীর ও মোহিনী তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়। পরে রনবীর সুখদেবের

কন্যাকে এবং মোহিনী তার পুত্রকে ভালবেসে আমাদের ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে

যায়।"

অর্জুন হঠাৎ কিং হয়ে উঠল। সে বলতে শুরু করল, "মিথ্যা কথা! শহরের

সকলেই জানে যে, সে একজন পুত্র। যদি মোহিনী তার সঙ্গে গিয়ে থাকে, তাহলে আমি

দু'জানকেই প্রাণদত্ত দিব। আপনি নিজের পুত্রকে ধর্ম ত্যাগের পরও ক্ষমা করতে পারেন।

আমি তা পারি না। আপনি বন্ধুত্বের মর্যাদা এভাবেই রক্ষা করলেন? পুত্র হয়ে যে ব্যক্তি

আমার মান সন্ত্রম ছুঁয়ে দিয়েছে তাকে বলিদান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে

আমার কন্যাটিকেও তার সঙ্গে পরিচয় যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন? বলুন, তারা

কোথায় আছে? আমি সমগ্র শূন্য-পূত্র তাল্লাশ করবো। তাদের ঘর বাড়ী ছাট্টিয়ে দেব।

আপনি নগরপতি। আপনার নিকট সিপাই আছে। তা বলে, জনতার ক্রোধের মুখে সিপাই

গিয়েও টিকতে পারবেন না, বলুন। তাদের আপনি কোথায় পাঠিয়ে নিয়েছেন?"

এন্য সময় হলে রামদাস এসব কথা সহ্য করতে পারতো না। কিন্তু এ মুহূর্তে

অত্যন্ত নরম সুরে বলল, "অর্জুন। তুমি তো জানো আমি ওসব হুমকিতে ভয় পাই না।

অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজন বোধে আমি আমার শেষ রক্ত বিন্দু ঢেলে

দিতেও প্রস্তুত আছি। তুমি বিশ্বাস কর। সে সুখদেবেরই ছেলে। আমি বছকে তার প্রমাণ

দেখতে পেরেছি। সমাজ তাদের দূরে সরিয়ে দেয়ার তারা শূন্যদের সঙ্গেই বাস করছিল।

কিন্তু ভগবানের ক্রমে! তিনি রনবীর ও মোহিনীকে তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।"

অর্জুনের রাগ কিছুটা প্রশমিত হয়ে এলো। সে বলল, "আপনি কি করে বিশ্বাস

করলেন যে, তারা সুখদেবের সন্তান?"

"সুখদেব ও কমলকে মহারাজার কারাগার থেকে উদ্ধার করার সময় আমি তাদের

যে তরবারি নিয়েছিলাম, সেটিই আমি মাধবের নিকট দেখতে পেয়েছি। সুখদেবের নামাঙ্কিত একটি আর্গটও দেখেছি। আর মাধবের চেহারা—সুরঙ্গ ভূমি নিজেও দেখেছ, সে কি অবিকল সুখদেবের মত নয়?”

“তবু আমি মোহিনীকে ক্ষমা করতে পারি না। সে আমার মুখে কাশি মাঝিয়ে দিয়েছে। আমি কি করে সমাজে মুখ দেখাবো। সুখদেব একজন শূদ্র মেয়ে লোককে বিয়ে করেছিল। সে মেয়ে লোকের গর্ভের সন্তান, চণ্ডাল।”

“অর্জুন! প্রেম উহু—নীহু বিচার করে না। সে সমাজের কোনই পরোয়া করে না। মানবতার দৃষ্টিতে চিন্তা করে দেখ। বল তো, মাধবের মত সুপুরুষ ভূমিদের শহরে কতজন আছে? ভূমিই তো বলেছিলে যে, সুখদেব কমলকে বিয়ে করে কোন অন্যায় করেনি। তারা উভয়ে একে অপরের জন্যই জন্ম নিয়েছে। আমি কশি, সুখদেবের পুত্র ও তোমার কন্যা ভগবানের ইচ্ছায়ই একে অপরকে ভালবেসেছে। তারা একজন অপর জনের জন্যই পৃথিবীতে এসেছে। মাধব মোহিনীর জন্য কাশীমন্দিরে নিজের মাথা কাটাতেও তৈরী হয়ে গিয়েছিল। মোহিনী মাধবের জন্য নদীতে ডুবে অথবা পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে জীবন দিতে প্রস্তুত। আমি নিজেই তোমার অবস্থা অনুধাবন করেছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম, মোহিনী ঐ ছেলের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে দৃঢ় সংকল্প, তখন তার পথরোধ করা আমি সম্ভব মনে করিনি। রনবীরের জন্য আমার মনে যে ব্যথা, মোহিনীর জন্য আমার মনোবেদনা তার চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়।”

“কিন্তু সমাজ কি বলবে?”

“বন্ধু! আজ পর্যন্ত সমাজের মুখ কেউ বন্ধ করতে পারেনি। কিন্তু সমাজ সমস্যার কোন সমাধান করতে পারে কি? ভূমি সমাজের ভয়ে নিজের সন্তানদের তো বলি দিতে পারোনা!”

“আর ধর্ম?”

“আমরা ধর্মের নামে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। মানবতার চেহারা বিকৃত করছি। মানুষে মানুষে হিংসা ও ঘেঁষাঘেঁষি সৃষ্টি করছি। ভগবানের সৃষ্ট মানুষের মধ্যে উহু ও নীহু জাতের প্রাচীর খাড়া করে রেখেছি। এমন ধর্ম ভগবানের পছন্দনীয় হতে পারে না। এ ধর্ম মানবতার কল্যাণ সাধন করতে পারে না।”

“রনবীর বেটা ছেলে। তার চলে যাবার দরুন আপনার তেমন অপমান না—ও হ’তে পারে। কিন্তু আমি হতভালার কি উপায় হবে? কাল সকালে শহরের শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই যখন জব্বলে চাইবে, মোহিনী কোথায়? আমি তাদের কি উত্তর দেব?”

“যদি মোহিনী নদীতে ডুবে মরতো কিংবা পাহাড় থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করতো, তাহলে ভূমি কি উত্তর দিতে?”

“আপনি আমার সত্ৰম রক্ষা করুন। ওরা কোথায় আছে, বলুন। আমি বৃষ্টিয়ে সুষ্টিয়ে মোহিনীকে এই অন্যায় কাজ থেকে বিরত করব। তাকে সম্পূর্ণ মাক করে দেব।”

“আমি এতটুকু জানি যে, মোহিনী চিরদিনের জন্যে সুখদেবের পুত্রের সঙ্গে চলে

গেছে। দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না। হতে পারে, তোমার কথার সে ঘরে ফিরে আসবে। কিন্তু সেটা প্রাণ চাঞ্চল্য ভরপুর মোহিনী নয়। ফিরে আসবে মোহিনীর নিস্প্রাণ দেহ। তুমি সমাজের আইন রক্ষার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। কিন্তু নিজেকে যাচাই করে দেখো তো, অন্তরে তোমার সমাজের সমগ্র রক্ষার চিন্তাটাই প্রকট, না পিতৃপ্রাণ সন্তানের জন্য ছটফট করছে? আমি মনে করি, ওটা পিতৃহননের আকুলি-বিকুলি। তাই যদি হয়, তাহলে মোহিনীকে ফিরিয়ে ঘরে নিয়ে এসে তাকে তিলে তিলে মৃত্যু ফল্গায় জুগতে দেয়াই কি পিতার কাজ? পারবে কি তুমি সেই জ্বালা সহ্যে? অর্জুন! তুমিও তো যৌবনে এক শূন্র বালিকাকে ভালবাসতে। তার জন্য তুমি সব কিছু ত্যাগ করতে রাজী ছিলে। কিন্তু সে বালিকা তার পিতার সঙ্গে পাহাড়ে চলে গিয়েছিল। যদি সে তোমার প্রত্যয়ে রাজী হতো, তাহলে তুমি কি সমাজের বন্ধন কেটে বের হবার জন্য প্রস্তুত হতে না? আমি সেদিন তোমাকে কত বুঝিয়েছি। তুমি আমাকে তখন তোমার শত্রু বিবেচনা করতেন। আজ তুমি কি সেই অর্জুনই আমার সামনে বসে কথা বলছ?”

অর্জুন নিরন্তর হয়ে পালংকের উপর উদাস দৃষ্টিতে বসে রইল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল কুড়ি বছর আগের এক দৃশ্যপট। চন্দ্রী রাত্ত শূন্র বালিকাকে নদীতে স্নান করতে দেখে তার মনে হয়েছিল, বৃষ্টি পূর্ণিমার চাঁদ নেমে এসেছে নদীতে। সে তার হাত ধরে বলেছিল, “শান্তি! তোমার জন্য আমি সব কিছু ছেড়ে দিতে রাজী আছি। তুমি আমার হও।” আজ তার কানে এক সাদাসিধা বালিকার জবাব প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল, “না, না, হতে পারে না। তুমি মহারাজার সৈনিক। তোমরা আমাদের গোত্রের হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের রক্তপান করো—তোমরা আমাদের শত্রু। তোমাদের প্রেম-ভালবাসায় বিশ্বাস করা যায় না।”

রামদাস জিজ্ঞেস করল, “বল অর্জুন! আমি অন্যায় কিছু বলিনি তো?”

অর্জুন চমকে উঠল। বলল, “আমাকে আর লজ্জিত করবেন না। সেটা ছিল যৌবনের উন্মাদনা। তখন আমি নির্বোধ ছিলাম।”

“না, না, শুধু তুমি নয়। এ বয়সে সকল মানুষই নির্বোধ হয়। তুমি বা সুখসেবের স্থলে আমি যদি হতাম, তবে তা—ই করতাম। রনবীরের মা যদি ক্ষত্রিয় ঘরে জন্ম না নিয়ে ছোট জাতের মধ্যে জন্মাতো, তাহলে তার জন্য আমি বিনা বিধায় সমাজের সকল বন্ধন কেটে দিয়ে ছেঁড় হয়ে যেতাম। তুমি যেটাকে যৌবনের উন্মাদনা বলছ, আমি সেটাকেই যৌবনের ধর্ম বলতে চাচ্ছি। প্রকৃতি যখন দুজনের মিলন চায়, তখন সমাজের কৃত্রিম প্রাচীর দিয়ে তাদের পৃথক করে রাখার প্রচেষ্টা মোটেই কল্যাণকর নয়। সমাজ পরিত্যাগ করার দরুন মোহিনী ও রনবীর সাময়িকভাবে হয়ত কিছুটা কষ্ট ভোগ করবে। কিন্তু সমাজের ভয়ে যদি তারা প্রকৃতির দাবী অস্বীকার করতো, তাহলে সমগ্র জীবন তাদের স্থলে পুড়ে মরতে হত, তাই নয় কি?”

অর্জুন মাথা উঠিয়ে বলল, “আমাকে মাফ করুন। আমি অনেক কড়া কড়া কথা

বলে ফেলেছি। আমি বুঝতে পারছি না, চিরতরে মোহিনীকে হারিয়ে তার মা বেঁচে থাকবে কি করে?”

“সন্তানের জন্য মার গ্রেহ-মমতার কূল কিনারা নেই। মোহিনীর মায়ের জন্য এর চাইতে খুশীর বিষয় কি হতে পারে যে, মোহিনী বেঁচে আছে এবং আনন্দেই আছে।”

“কিন্তু তার মা যদি তাকে দেখতে চায়, তাহলে পাহাড়ে কি করে বুকের বের করবে?”

“সে দায়িত্ব আমার।”

“কবে নাগাদ তা সম্ভব হবে?”

“তুমি এখন বাড়ী গিয়ে বোন সাবিত্রীকে সাবুনা দাও। শীঘ্রই আমি তোমাদের সেখানে নিয়ে যাবো। আপাতত লোকের প্রণের জবাবে বলবে, মোহিনী তার মামার বাড়ী গিয়েছে।”

অর্জুন নীচে নেমে যাচ্ছিল। রামদাস বলল, “শোন, আমি তোমার এক জায়গায় যাব। দুপুর নাগাদ হয়ত ফিরে আসতে পারব না। শহরে বেশ কিছুটা উত্তেজনা রয়েছে। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব তোমার।”

“আপনি কোথায় যাবেন?”

“আমার বাতের ব্যাখার ঔষধ তৈরী করতে হবে। কিছুদিন থেকে ব্যাখাটা বেড়েছে। আর সে ঔষধের জন্য কিছু বন্য লতাগুল্মাদি সংগ্রহ কর। আমি সেগুলো সংগ্রহ করতে যাব।”

যদিও একথায় অর্জুনের মনে কিছুটা সন্দেহ রয়ে গেল, তথাপি সাবিত্রীর অস্থিরতা চিন্তা করে সে বাড়ীর দিকেই রওনা হল। অর্জুনের যাবার পর রামদাস অনুভব করল, একটা বিরাট বোঝা যেন তার সহসাই ভারকা হয়ে গেল।

অন্ধ্রক্ষণ পরই ঢাল-তরবারি ও বীর ধনুকে সজ্জিত হয়ে রামদাস খোড়ার পিঠে চড়েবসল।



## চল্লিশ

com

প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত রনবীর ও মোহিনী দুর্গম পাহাড়ী পথে এদিক-সেদিক ঘুরল। অবশেষে এক জায়গায় আশ্রয় জ্বলতে দেখে রনবীর বলল, "আমরা গৌছে গেছি। লালু আমাকে বলেছিল, সে আশ্রয় জ্বালিয়ে রাখবে। ছেলেটি খুবই বুদ্ধিমান।"

মোহিনী জিজ্ঞেস করল, "কে এই লালু?"

রনবীর বলল, "সে এক অন্ধুত ছেলে। সিংহের মত সাহসী। তার চোখ দু'টি বাজপাখীর চোখের মত তীক্ষ্ণ আর শরীরটি চিতাবাঘের মত গঠনশীল। তুমি সারা জীবনেও তার ঋণ শোধ করতে পারবে না। যদি লালু আর মুহূর্ত কাল আগে ছুটে গিয়ে পূজারী ঠাকুরকে বাধা না দিতো, তাহলে পরের মুহূর্তেই ঘাতকের খড়্গ মাথবের মুণ্ডটি সেই থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতো।"

"আমি তার পরিচয় জানতে চাই।"

রনবীর মোহিনীকে লালুর পরিচয় জানিয়ে দিল। মোহিনী বলল, "এবার বুঝেছি। এই সেদিন মাত্র বাবা ঘরের ছাদে একটা নকল চাদর ঝুলিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুম থেকে জেগে চাদর আর তার জুতা খুঁজে পাননি। এটা তবে নিশ্চয়ই ঐ লালুর কাজ ছিল।"

ইঠাৎ আওয়াজ শোনা গেল, হঠাৎ সেবী। ঐ চাদরখানা এখনও আমার সঙ্গে আছে। তবে জুতাগুলো আমার কোন কক্ষে আসেনি। তোমার বাবার পা তীষণ বড়।"

রনবীর ও মোহিনী ঘোড়া-ধামিয়ে অন্ধকারে লালুকে দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু ঘোর অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। রনবীর ডাকল, "কে? লালু নাকি?"

লালু উচ্চ হাসিকে ফেটে পড়ল এবং এগিয়ে এসে ঘোড়ার লাগাম ধরল। বলতে লাগল "আপনি না বলেছিলেন, সব পথঘাটই আপনার চেনা। যদি আমি আশ্রয় না জ্বালাতাম তাহলে কেমন হতো? যাহোক, এখানে ঘোড়া থেকে নেমে যান, সামনের পথ খুব ঢালু।"

রনবীর ও মোহিনী ঘোড়া থেকে নেমে গেল। রনবীর জিজ্ঞাসা করল, "কি লালু, পথে তেঁমির কোন কষ্ট হয়েছিল?"

লালু বলল, "পথে তো কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু এখানে এসে আমি পাঁচুর মৃত্যুর

খবর বলার পর থেকে মাধব, শান্তা আর শুদের মা কেবল কঁদছেন। এটা দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।”

\* \* \* \* \*

বুড়ো তেজু ক্রান্তির দরুন তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে। লালু পোষা জন্তুগুলো গাছেরা নিচ্ছে। কমল, রনবীর, মোহিনী, মাধব এবং শান্তা অনেকক্ষণ ধরে পাঁচুর মস্তুর জন্য দুঃখ করল। কমল পাঁচুর ভালবাসা, ভ্যাগ ও বিশ্বস্ততার ঘটনাবলী উল্লেখ করে বারবার জ্বকরে উঠতে লাগল। আর রনবীর তাকে সাধুনা দিতে লাগল। মোহিনী চুপচাপ বসে আছে। মাধব ঘুনাঙ্করেণ আশা করেনি, মোহিনী এভাবে চলে আসতে পারবে। সে কেবল বারবার নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগল, “এটা কি বাস্তবিকই সম্ভব? আমি ষণ দেখিনি তো!”

এটা তাদের দুঃখ কষ্টের দ্বিতীয় রাত্রি। শান্তা শেষ রাত্রির দিকে একটি পাথরের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। মোহিনীকে ক্রিমুতে দেখে কমল তার মাথাটি হাঁটুর ওপর রেখে বলল, “শুয়ে পড় মা!”

সকালে মোহিনী জেগে উঠে কমলকে তার মুখে বারবার চুমো খেতে দেখে দুবাহ্ন দিয়ে কমলকে জড়িয়ে ধরে “মা” বলে ভেঁকে উঠল।

কমলও তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে “আমার সেনার মা” বলে আনন্দানু ফেলতে লাগল।

মোহিনীরও দু’ জোখ থেকে কৃতজ্ঞতার অশ্রু সেনে এলো।

রনবীর ঝরঝর কাছে বসে হাত মুখ মুখে নিখিল। শান্তা ছাগলের দুধ গরম করে একটি বাটিতে ঢেলে নিয়ে তার কাছে দিয়ে দাঁড়াল। রনবীর মূদু হেসে বলল, “আগে মোহিনীকে দাও।”

শান্তা বলল, “মা তাকে আগেই দিয়েছেন।”

রনবীর শান্তার নিকট থেকে বাটি নিয়ে দুধটুকু পান করল। এ দুধের স্বাদ তার কাছে আজ একেবারে অপূর্ব মনে হল।

\* \* \* \* \*

কিছুক্ষণ পর রামদাস এসে পৌঁছিল। লালু ছুটে গিয়ে তার ঘোড়ার লাগাম ধরল। মোহিনী ও রনবীর এগিয়ে গিয়ে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। তাদের দেখে মাধব এবং শান্তাও তার পদধূলি নিল। রামদাস গ্রেহতরা দৃষ্টিতে শান্তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মাধায় হাত বুলাতে বুলাতে কমলকে লক্ষ্য করে বলল, “আমাকে তুমি চিনতে পারছ, বোন?”

কমল অস্বস্তিকৃত পলায় বলল, “আপনাকে কি করে তুলতে পারি, দাদা! আপনার কথা জীবনে কেনদিনই তুলতে পারব না। আপনার শরীর কেমন আছে?”

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে রামদাস বলল, “আমি তো ভালই আছি, বোন। কিন্তু তোমাদের জন্য এ জায়গাটা তো নিরাপদ মনে হচ্ছে না, কমল। সামনের ওই উঁচু

পাহাড়টির ওপাশে একটি বস্তি আছে। তোমাদের স্বপ্নের অনেক সেখানে বাস করে। আগামীকাল সেখানে তোমরা চলে যেতে পারবে। তোমরা হয়ত পথ চিনবে না। কিছু দূর গেলে কোন রাখাল কিংবা শিকারীর সঙ্গে অবশ্যই তোমাদের দেখা হয়ে যাবে।”

“দাদা! আমি এই পাহাড়ের অলিগলি সব চিনি। তাছাড়া তেজু কাকা ও লালু সঙ্গে রয়েছে। তারা পথচাট ভাল করেই চেনে।”

তেজু হাত জোড় করে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। রামদাস তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, “তুমিও কি এদের সঙ্গে যাবে?”

“অজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ!”

“তাহলে তো খুবই ভাল হয়। দেরী করে কাজ নেই। এখনই তোমরা রওনা হয়ে যাও। আমিও কিছু দূর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি।”

শান্তা ও মোহিনী একটি ঘোড়ার সওয়ার হল। মাধব ও রনবীর দু’টি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। রামদাস কমলকে নিজের পেছনে ঘোড়ার পিঠে ভুলে নিল। তেজু ও লালু বোকা বহনকারী ঘোড়া এবং অন্যান্য পোষা জন্তুগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। পশ্চিমধ্যে রামদাস কমলের নিকট থেকে সুখদেব ও কমলের সকল বস্তুসমূহ গুনল। কমল খুবই ব্যথা ভরা কণ্ঠে পীচুর সেবা যত্নের কথা বলল।

রামদাস বলল, “বড়ই দুঃখের কথা। তোমরা এত কাছে ছিলে অথচ আমি তার কিছুই জানতে পারিনি। পীচুর মৃত্যুর জন্য তোমার খুবই আফসোস হচ্ছে। জন্ম মৃত্যুর ওপর মানুষের কোন হাত নেই। সে খাই হোক, এবার কিন্তু আমি রনবীর ও মোহিনীকে তোমার হাতে সঁপে দিতে এসেছি কমল।”

কমলের কোন উত্তর না পেয়ে রামদাস পেছন ফিরে তাকাল। দেখল, সে নীরবে চোখের পানিতে অতীতের সকল দুঃখ হুলার চেষ্টা করছে।

\* \* \* \* \*

দুপুর বেলা সূর্য দলটি একটি সাহাড় ডিঙিয়ে নিচের সবুজ উপত্যকায় পৌঁছে গেল। তারপর একটি ছায়া শীতল স্থানে থেমে তেজু ও লালুর জন্য তারা অপেক্ষা করতে লাগল। মোহিনীর চেহারা দেখে রামদাস তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বলল, “মোহিনী! তোমার জন্য একটি সুখবর আছে। তোমার বাবা আমার নিকট এসেছিল। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়েছি। এখন সে আর তোমার ওপর অসন্তুষ্ট নয়। মাধব সুখদেবের পুত্র, একথা সে জানতো না। আমি তার সঙ্গে কথা দিয়েছি যে, খুব শীঘ্রই তোমার মাতা-পিতাকে তোমার কাছে নিয়ে আসব।”

রামদাস নিজের পুত্রের দিকে তাকিয়ে বলল, “রনবীর! আমাকে তোমার নয়া বাসস্থানের ঠিকানা জানাতে দেরী করোনা, “রনবীর বলল, বাবা, তুমি আমাদের সঙ্গেই চল না।”

মোহিনী বলল, “হ্যাঁ, কাকাবাবু, চলুন।”

মাধব বলল, “খুবই ভাল প্রস্তাব, আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমরা আপনার কোন কষ্ট হতে দেব না।”

শান্তা নীরব ছিল। রামদাস তার নিকে তাকিয়ে বলল, “শান্তা বোধ হয় আমাকে সঙ্গে নিতে চায় না, আর বোধকরি সে জন্যই সে কোন কথাই বলছে না।”

শান্তা শশবাক্ত হয়ে বলে উঠল, “বাবা! আপনি যদি আমার কথা মানেন, তাহলে একবার নয়, হাজার বার বলছি, আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমরা আপনার শ্রেয়-ছায়ায় পরম সুখেই থাকবো।”

রামদাস বলল, “বাবা! তোমাদের কোন অনুরোধই আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। শীগগীরই আমি তোমাদের কাছে চলে আসছি। যে পূর্ণ কুটিরে আমি ও রনবীর থাকবে, তা আমার নিকট শহরের বড় বড় সুদৃশ্য মহলের তুলনায় অনেক বেশী সুখের হবে। তবে বর্তমান অবস্থায় আমি শহর ছেড়ে আসতে পারছি না। আমি সেখানে থাকার ফলে শত শত মানুষ নির্ধাতন থেকে রেহাই পাবে। হঠাৎ যদি আমি সরে যাই তাহলে গঙ্গারামের মত কোন লোক নগরপতি হয়ে যাবে এবং শিরীষ মানুষের ওপর পুনরায় অত্যাচার শুরু করে দেবে। তাই যতক্ষণ আমি একজন হৃদয়বান ব্যক্তিকে আমার দায়িত্ব অর্পণ করতে না পারবো, ততক্ষণ আমাকে শহরে থাকতেই হবে।”

রনবীর বলল, “বাবা! এসব ঘটনার পর ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয়ই রাজ দরবারে গিয়ে আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করবে। তখন রাজা হয়ত আপনার সঙ্গে ভাল ব্যবহার না-ও করতে পারেন। যদিও তিনি আপনাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়ে থাকেন তবু এসময় আমার আশংকা হচ্ছে যে, হিংসুক ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় তিনি হয়ত দিশেহারা হয়ে পড়তে পারেন।”

রামদাস জবাবে বলল, “রাজা সব কিছুই সহ্য করতে পারেন। কিন্তু তাঁর রাজ্যের একটি অংশ চিরতরে হারানো কিছুতেই তিনি মেনে নিতে পারবেন না। তিনি ভালভাবেই জানেন যে, আমি ছাড়া এ শূন্ত্রদের শাস্ত রাখা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। অতীতের যুদ্ধগুলিতে রাজ সৈনিকদের বারবার পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। সেজন্য রাজা খুবই দুঃখিত। সুখদেবের বিরুদ্ধে যারা তাকে ক্ষেপিয়েছিল, তাদের প্রতি রাজা খুবই অসন্তুষ্ট। তিনি মনে করেন, সুখদেবই তাকে ন্যায় পথের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি তা গ্রহণ না করে ফুল করেছেন। এখন তাই শূন্ত্রদের প্রতি ন্যায় ও দয়া প্রদর্শনের নীতি তিনি খুবই পছন্দ করেন।”

রামদাস মাধবকে বলল, “বাবা মাধব! আমি তোমার সম্পর্কে খুবই নৈরাশ্যজনক মনোভাব প্রকাশ করি। স্বপ্নের সুমধুর দৃশ্য যাদের অন্তরকে পরিতুষ্ট করে রাখে, তারা নিজের বা অপরের কোনই কল্যাণ করতে পারে না। সমাজের বিভেদ সৃষ্টিকারী আইন কাবুল তোমাদের দ্বারা পরিবর্তন করা যাবে না। দুনিয়া একটি রাজপথ। বহু জাতি এ পথ ধরে যাত্রা করেছে। ভবিষ্যতেও করতে থাকবে। এ পথে প্রতিটি জাতিকেই প্রতিপদে গভীর খাদ, ঘন অন্ধকার ও ভয়ানক বড় ভুফানের সম্মুখীন হতে হয়। এ

পথের সকল যাত্রীই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে চায়। কেউ পেছনে পড়ে থাকে পছন্দ করে না। এ কঠোর প্রতিযোগিতার মুখে যারা মাঝ পথে খাদ দেখে নিরুদ্ধ্যম হয়ে যায় না বরং অসীম সাহসিকতার সঙ্গে অঙ্ককার ও ঝড়-তুফানের বিরুদ্ধে লড়ে যায়, শুধু তারা ই সফলতা অর্জন করতে পারে। পশ্চিমঘো খাদ দেখে যাদের পা শিথিল হয়ে পড়ে, ঝড়-তুফান দেখে যারা অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তারা কখনও বিজয়ী হ'তে পারে না। দ্রুতগামী পথিক কখনও তাদের হাত ধরে সঙ্গে নিয়ে যায় না। বরং পায়ের তলায় তাদের পিষে ফেলে সামনে এগিয়ে যায়। সবাই সামনে এগিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত। পেছনে তাকানোর ফুরসৎ থাকে নেই। তাই ইতিহাসে তাদেরই উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা বীর দর্পে সকল বাধাবিপত্তির মাধ্যমে পদাঘাত করে চলার পথ করে নেয়। অঙ্ককার খাদে যারা তাকিয়ে গেছে, তাদের নাম কে মনে রাখে বল?"

"এ পথে কখনও মুরুম্বুমি আর কখনও বা মরুন্দ্যান দেখা যায়। যারা মরুপথের দুঃসহ কষ্টে উন্মাদহারা হয়ে মরুন্দ্যানের ছায়া ও অরামের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে, ক্রমে তারা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে যায়। আর ঐ কক্ষে পেছনের যাত্রীরা সামনে এগিয়ে যায়। যাবার পথে ঘুমন্ত পথিককে জাগিয়ে দেওয়ারও তারা কোন প্রয়োজন বোধ করে না। বরং ঘুমন্ত পথিককে গোলামীর কঠিন শিকলে বেঁধেই রেখে যায়।"

"তোমার জীবনের উদ্দেশ্যে ঘটেছে যে সমস্যা, তারা অর কাল আগেও গোলামীর জিজিরে আবদ্ধ ছিল। শত শত বছর আগে তারা অঙ্কুত হয়ে গোলামীর জীবন যাপন করছে তাদের অবস্থা দেখার সুযোগ তোমার হয়নি। তারা শক্তিশালীদের লাঠিকে আইনের শেষ দফা মনে করে। যদি তাদের বল যে, তাদের এবং উঁচু জাতের লোকদের মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই, তাহলে তারা চমকে উঠে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। যদি তাদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে বল, তাহলে তারা তোমাকে উন্মাদ মনে করবে। যদি তুমি তাদের বল গণবানের দৃষ্টিতে উঁচু নীচু বলে কোন ভেদাভেদ নাই, তাহলে তারা তোমাকে পাগল মনে করবে। শাসক গোষ্ঠীর আইন তাদের ধর্ম। তাই স্বাধীনতার সকল প্রচেষ্টাকে তারা ধর্মের বিরোধিতা বিবেচনা করে। ধর্মই যাদেরকে ঠিক ও ঠিক হয়ে বাস করতে শিক্ষা দেয়, তাদের জাগিয়ে তোলা খুবই কঠিন। তবু আমি তোমাকে নিরাশ হতে বলবো না। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বহু জাতি উন্নতির শীর্ষস্থানে থেকে অধঃপতিত হয়ে পতনের গভীর খাদে নেমে গেছে। আবার গভীর খাদের তিতর থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেও বহুজাতি উন্নতির শীর্ষস্থানে পৌঁছতে পেরেছে। যারা নিজেদের অধিকার অর্জন করতে দৃঢ় সংকল্প তাদের ঠিকিয়ে রাখার সাধ্য কারো নেই। তোমাদের মানবীয় অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার দরুন তাদের সে অধিকার ফিরে পাবার জন্য তোমরা সংগ্রাম করছ কোথায়? তোমাদের দাবী তাদের মন্দিরে গিয়ে পূজা করতে পারা, তাদের শহরে যাতায়াত করা এবং তাদের পূজা পার্বণে অংশীদার হওয়া। ডাকাত যদি কারো বাড়ী দখল করে নিয়ে বাড়ীর মালিককে

অন্ধকার কুঠরীতে বন্দী করে রাখে, তাহলে সে ব্যক্তি কি তার বাড়ী ও স্বাধীনতার জন্য লড়বে, না অন্ধকার কুঠরীতে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য ডাকাতের নিকট আবেদন জানাবে? ডাকাত তার বাড়ী ও সকল ধন-সম্পদ দখল করে নিয়ে তাকে বন্দী করেছে। এখন হাতের বাধন একটু শিথিল করে দেয়া অথবা সামান্য কিছু খাদ্য ও পানীয় দান করার দরুন ডাকাতকে দেবতা মনে করা কত বড় নিবুদ্ধিতা। তোমার যোগোত্রীদের আজ অনুভূতি পর্যন্ত নেই যে, তারা বর্ণ-হিন্দুদের চালাকিগে গোলামীর জীবন যাপন করছে।”

“মাধব! আত্মতোলা জাতিকে জাগিয়ে তোলা খুব কঠিন কাজ। তোমার পিতা একজন বীর পুরুষ ছিলেন। তার মনে ছিল গগনচুম্বী উচ্চাকাঙ্খা। আমার মনে হয়েছিল, পতিত জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্যই ভগবান তাকে সৃষ্টি করেছেন। এদেশে এক সর্বাঙ্গিক বিপ্লব সৃষ্টি করার যোগ্যতা তার ছিল। কিন্তু তিনি বিশেষ আপদের ঘূর্ণিপাকে নিচিহ্ন হয়ে গেলেন। অত্যাচারিত মানব গোষ্ঠীর জন্য তার মনে ছিল অপরিসীম দরদ। তাদের তিনি ভালবাসতেন, কিন্তু তাদের পক্ষ হয়ে তিনি বুকটান করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে পারেননি। যদি বোন কমল নারাজ না হন, তাহলে আমি বলব, তোমার মাতার সংসর্গই তাকে বৈরাগীর জীবন যাপন করতে প্রেরণা দেয়। যে ভাবে তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল কমল, তেমনিভাবে তোমারও একমাত্র কাম্যকল্প হচ্ছে মোহিনী। মোহিনীর বেশী এ সমাজের কাছে তুমি কিছুই চাও না। তুমি এখন যাদের নিকট যাচ্ছ, তারা স্বাধীন জীবন যাপন করছে। সেখানে যাবার পর উঁচু জাতের লোকদের শহর ও মন্দিরে যাবার খেয়াল তোমার মনে থাকবে না। মোহিনীকে লাভ করার পর আর তোমার মূর্তি গড়ার প্রয়োজনও রইল না। তা বলে নিজেই স্বাধীন মনে করে তুমি যদি ঘুমিয়ে পড়ো, তাহলে জেগে নাও এ নিদ্রা চিরসুখের কখনও হতে পারে না। গঙ্গারামের মত কোন নির্ধর সেনাপতি এতদঞ্চলে কোন দিন পৌঁছে যাবে এবং স্বাধীন লোকদের গলায় সে গোলামীর শিকল পরিয়ে দেবে।”

মাধব এতক্ষণ মাথা নত করে রামদাসের বক্তৃতা শুনছিল। এবার সে বলল, “আমার মনে হয় আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমি ভীরা কাপুরুষ নই। সুখনিদ্রায় মগ্ন হয়ে অগণিত মজলুম মানুষকে ভুলে যাবার মনোভাব আমি পোষণ করি না। অধঃপতিত জাতিকে জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গী তিররূপ। আমি শক্তিমানের এ অধিকার স্বীকার করি না যে, তার ইচ্ছা মার্কিন দুর্বলকে গোলামী করতে বাধ্য করবে। এ দুনিয়ার সত্যিকার অর্থ আইন চলুক এটা আমি চাই না। আমি ন্যায়েনীতি চাই। অত্যাচার মার্কিনকে হিন্দু জঘুতে পরিণত করে এবং তার ফলে দুই শ্রেণীর লোক পরস্পরের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। পরিণামে জালিম মজলুমের স্থান দখল করে নেয়। আমি যেমন দুর্বলদের বাধ্যতামূলক গোলামীর বিরোধী তেমনি শক্তিমানের অনুগ্রহই কর্তৃত্বের অধিকারও মানি না। আমি ন্যায়েনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য লড়ব। যতদিন মানব সমাজে একে অপরের প্রভু অথবা দাস হিসাবে পরিচিত না হয়, মানুষে মানুষে

হোয়া-ছুরির বিধি-নিষেধ মিটে গিয়ে যতদিন না মানুষকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়, ততদিন পর্যন্ত আমার সংগ্রাম আপোশহীন ভাবে চলবে।”

রামদাস বলল, “বাবা! এটা তোমার স্বপ্ন। দুনিয়ার কোন দেশেই তোমার ঐ কল্পিত সমাজের অস্তিত্ব নেই। যদি কোন মানুষ ঐ ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করে, তাহলে দুনিয়ার সকল দুই প্রকৃতির লোক তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। দুনিয়ার সকল মানুষকে সত্যিকারভাবে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার আকাংখা পোষণ করা আর তা বাস্তবায়িত করা এক কথা নয়, মাধব।”

মাধব জবাবে বলল, “দুনিয়ায় কোন কিছুই অস্তিত্ব না থাকলেও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার যুক্তি নয়। শুধায় যারা বাস করতো তারা আলো বাতাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ঘাস পাতার সাহায্যে ঘর তৈরী করত। এ ঘর যখন বৃষ্টি বাদল ও ঝড় ভূফান থেকে মানুষকে নিরাপত্তা দানে ব্যর্থ হতো, তখন মানুষ মাটি ও পাথরের সাহায্যে মজবুত ঘর তৈরী করতে বাধ্য হয়েছে। প্রয়োজনের অনুভূতিই কর্মের প্রেরণা যোগায়। আজ দুনিয়ায় সব চাইতে বড় প্রয়োজন হচ্ছে শান্তির। শক্তিমানদের জুলুমই মানুষকে ন্যায়ের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবে। আমি স্বীকার করি, মজলুম মানুষই সাধরণভাবে এ জাতীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। এটাও সত্য যে, মানুষের হাড়-মাংসের উপর দেবতাসিঁরি প্রতিষ্ঠাভিলাষী অসৎ প্রকৃতির মানুষেরা ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা কিছুতেই বরদাশ্ত করবে না। কিছু আমার বিশ্বাস, সত্য ও ন্যায়ের করাত সকল অসত্য ও অন্যায়ে লৌহ শিকল কেটে ছিন্নতির করে দেবেই। সেই সমাজ ব্যবস্থাই জরী হবে, যে সমাজের তরবার সকল মানুষকে একই চোখে দেখেন। যার মন্দিরে সকল মানুষের জন্য থাকবে অবাধ প্রবেশাধিকার। সেখানে কোন মানুষই অস্পৃশ্য বিবেচিত হবে না। সে দিন বেশ দূরে নয়, যে দিন মানুষ তার বংশ কৌলিন্যে পরিচিত না হয়ে চরিত্র ও কার্যকর্মের দ্বারা পরিচিত হবে। শক্তিমানের লাঠি সেদিন ন্যায়ের খুরধার তরবারির সামনে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে। যদি সে দিন পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকি, তাহলে ঐ সৈন্যদলে আমিও একজন সৈনিক হিসাবে शामिल হব। তখন দুনিয়া দেখতে পাবে যে, আমি কাপুরুষ নই।”

রামদাস বলল, “তর্কবাক্য করুন, সে দিন যেন অতি দ্রুত আসে। সেদিন আমিও তোমাদের পক্ষে যোগদান করব। কিন্তু যদি কেউ ঐ কল্পিত সমাজের স্বাক্ষা উল্লেখন না করে?”

মাধব বলল, “স্বাক্ষর অধিারে যার হাতে মশাল নেই, সে পথ চলবে কি করে? তার জন্য তো সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। আমিও অরুণোদয়ের প্রতীক্ষা করতে থাকব।”

রামদাস কিছু হেসে বলল, “হ্যাঁ, তাহলে উষাগমের পূর্বে শহর ও মন্দিরের দিকে পা বাড়ান। এটাই আমার শেষ উপদেশ।

রামদাস রনবীরকে লক্ষ্য করে বলল, “আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে, বাবা! কোন

কমলকে তুমি নিজের 'মা' মনে করবে। শান্তার মনে কোন কষ্ট দিবে না। মাধবকে নিজের ভাই হিসাবে মানবে। আর মাধব! তোমাকে একথা বলে যাবার দরকার মনে করছি না যে, মোহিনীর যত্ন নেবে। বোন, কমল! আমাদের সমাজের কোন পুরোহিতই এদের বিয়েতে যোগদান করতে রাজী হবে না। তারা এ বিষয়টি সম্পর্কে কিছুই জানতে না পারাটাই ভাল মনে করি। পনের দিন পর রনবীরকে আমার নিকট পাহিয়ে দেবে। আমি তার সঙ্গে চলে আসব। মোহিনী! তোমার মাতাপিতাকেও সঙ্গে নিয়ে আসবা।”

মোহিনী ও শান্তার মুখমন্ডল লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। রনবীর ও মাধবের চেহারায় আনন্দের চিহ্ন ছিল সুস্পষ্ট। কমলের চোখের কোণ থেকে আনন্দের গুড়িয়ে পড়ল। রামদাস ঘোড়ায় চড়ে আর একবার সকলের মুখের দিকে মমতাজ্বরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিনায়নিল।

\* \* \* \* \*

আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে উড়ে চলছে মেঘমল্লা। রামদাস একটি উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ঘোড়া বামিয়ে দিল। তারপর নীচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল, তার পুত্র ও পুত্রবধু সহকারে ছোট দলটি উপত্যকার শেষ প্রান্তে পৌঁছে একটি পাহাড়ী পথ বেয়ে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। রামদাস অনেক সময় পর্যন্ত তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ঐ দলটি পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলে সে ঘোড়াটিকে নীচের দিকে ছুটিয়ে দিল।

তার মস্তিষ্কে তখন নানারকম চিন্তা উঠানামা করছে। কখনো চোখে রামদাস দেখতে পেল, দূর পাহাড়ের পায়ে উঠে সবদিক পাছের ছায়ায় একটি ছোট্ট কুটিরের রনবীর ও শান্তা বসে। আর স্বয়ং রামদাস তাদের মধ্যস্থলে। শান্তার কোলে একটি ছোট্ট শিশু হাত দু'খানা নাচিয়ে খেলা করছে। শান্তা যেন বলছে, যাও তোমার দাদাঠাকুরের কোলে। রামদাস ভুলভুলে নরম শিশুটিকে কোলে তুলে নিল। শিশুটি খল খল করে হেসে উঠল। সে তার নরম দু'খানি হাত দিয়ে রামদাসের লম্বা গৌফ টেনে ধরল। রামদাস পরম সেহে শিশুটির হাতে ও পায়ে চুমো খাচ্ছে।

## একচল্লিশ

রামদাস এখন বাড়ীর পথে চলেছে। তারি মনে নানাবিধ চিন্তার মৃদু মৃদু ঢেউ খেলে যাচ্ছে। ভগবানের ধর্ম কি করে এত হিংসার প্রশ্ন দিতে পারে, তা সে কিছুতেই বুঝে



উঠতে পারছে না। একমাত্র পুত্রকে বনবাসী করে আজ রামদাস রিণ্ড হতে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। অথচ রনবীর কোন পাপ করেছে বলে তার বিশ্বাস হয় না। সুখদেবের কন্যা শান্তাকে ভালবেসে রনবীর স্তনের সমাদর করেছে মাত্র। তবু আজ সে সমাজদ্রুত। মোহিনীর মাতাপিতাই বা কি করে এ বিচ্ছেদের ছালা সহ্য করবে? অথচ মোহিনী সুখদেবের পুত্র মাধবকে ভালবেসে কোন অপরাধ করেনি। তথাপি ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নৈরাশ্র্যে তাদের দেশ ত্যাগ করতে হল। ভগবানের সৃষ্ট অগণিত মানুষ বন-অরণ্যে পশুর মত জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। ভগবানের ধর্মই তাদের মানুষের মর্যাদা দিতে প্রস্তুত নয়। অথচ উঁচু বা নীচু সমাজে জন্ম নেয়া কারো নিজের ইচ্ছাবীন নয়। তবু উঁচু জাতের মানুষ তথাধর্মিত অক্ষুণ্ণদের দু' চোখে দেখতে পারে না। মানুষে মানুষে এ হিংসা, বিদ্বেষ ও বৈষম্য ভগবান শিখিয়েছেন বলে রামদাস কিছুতেই মনে নিতে পারছিল না। মনে মনে তাই সে প্রার্থনা করল, ভগবান! তুমি এ বিতেন দূর কর। মানুষকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত কর। সমাজে হিংসার পরিবর্তে ভালবাসা ও সম্প্রীতি এনে দাও।

যৌবনপুরে প্রবেশ করে রামদাস অনুভব করল সবটাই যেন একটা ভয় ও নৈরাশ্র্য বিরাজ করছে। কারো মুখে হাসি নেই। দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে রামদাস নিজ বাড়ীতে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে লোকজন এসে জড়ো হতে লাগল। তাদের চোখ মুখ ভ্রান। সমগ্র নগরটিতে কে যেন বিবাদের ছায়া বিস্তার করে দিয়েছে।

অর্জুন এসে বলল, "ধবর খুবই খারাপ। মুসলমানদের এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী রাজধানীতে এসে হামলা চালিয়েছে। আমাদের রাজ চক্রবর্তী নিহত হয়েছেন। নবাবত মুসলিম সৈন্যবাহিনী রাজধানী দখল করে নিয়েছে।"

"এ ধবর কে নিয়ে এলো?"

"রাজধানী থেকে মুসলমান সেনাবাহিনীর চিঠি নিয়ে একজন দূত এসেছে। সে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চিঠিখানা আপনার হাতেই দিতে চায়।"

"কোথায় সে দূত?"

"আমাদের অতিথিশালায় বিদ্রাম করছে। সে এক অদ্ভুত মানুষ। এ শহরের সৈন্য ও পুলিশদের কিছুমাত্র পরোয়া না করে সে একা এখানে চলে এসেছে। অতিথিশালায় বিদ্রামপত্র কিছুই ব্যবহার করছে না। তার নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে সে মেঝের উপর শুয়ে থাকে, সঙ্গে নিয়ে আসা শুকনো ঠাট্টা ও ফলমূল খায়, পুকুর থেকে হাত পা ধুয়ে এসে পশ্চিমমুখী হয়ে নামাজ পড়ে।"

রামদাস কিছুক্ষণ বিদ্রাম করে বৈঠকখানায় গিয়ে বসল। অতিথিশালা থেকে অপেক্ষমান দূতকে নিয়ে আসার জন্য ইতিপূর্বেই লোক পাঠানো হয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই একজন সীর্ষকায় গৌরবর্ণ স্বাস্থ্যবান যুবক বৈঠকখানায় প্রবেশ করল। রামদাস দাড়িয়ে তাকে সম্বোধন জানাল। যুবক বিজ্ঞেস করল, "আপনিই কি রামদাস?"

রামদাস সম্বতিসূচক জবাব দিলে যুবক তার হাতে একখানা চিঠি নিয়ে আসন

গ্রহণ করল।”

রামদাস চিঠিখানা খুলে পড়তে শুরু করল।

“বিছমিত্রাহির রাহমানির রাহীম।

আমি এক ও অধিতীর আত্মাহ তায়ালার এক নগণ্য বান্দাহ আপনাকে জানাচ্ছি যে, আপনাদের রাজচক্রবর্তী মানুষের প্রতি জুলুম ও অবিচারের শাসন কায়েম করে রেখেছিলেন। তাকে ঐ ব্যবস্থা সংশোধন করার আহবান জানানোর জবাবে তিনি লড়তে চেয়েছিলেন। সুমহান আত্মাহর অপার করুণায় রাজচক্রবর্তীর বিপুল সংখ্যক অত্যাচারী সৈন্য পরাজয় বরণ করেছে এবং রাজা নিজেও যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছেন। মুষ্টিমের পুরোহিত ও পুজারী ছাড়া জনসাধারণ এ অত্যাচারী শাসকের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে আজ আনন্দ প্রকাশ করছে।

আপনি ও আপনার অধীনস্থ সকলকেই ইসলামের শান্তিপূর্ণ স্বীকৃতি কবুল করার জন্য আহবান জানাচ্ছি। যদি তা না করেন, তাহলে ইছলামী শাসনরীনে নিরাপদে জিম্মি নাগরিক হিসাবে বসবাস করার পূর্ণ সুযোগ আপনাদের রয়েছে। আপনাদের সকলের জ্ঞান-প্রাণ, ধন-সম্পদ ও ইচ্ছিত সত্ত্বমের পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হবে। নিজেদের ধর্ম পালনে আপনাদের কোন বাধা দেয়া হবে না। শুধু শেখমামুলক শাসনকার্য থেকে আপনাদের সরে থাকতে হবে। এ দুটোর মধ্যে যে কোন পথ গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা আপনাদের রয়েছে।

এরপরেও যদি আপনারা সকল সুযোগ-সুবিধা পরিত্যাগ করে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে আমরাও আপনাদের সমুখীন হতে বাধ্য হব। তখন দেখতে পাবেন যে, আত্মাহর বান্দারা মৃত্যুকে মোটেই ভয় পায় না। আর ঐ যুদ্ধে লোকক্ষয় ছাড়া আপনাদের কোনই ফায়দা হবে না। করিণ সত্য সমাগত ও মিথ্যা অপসারিত। অসত্য ও অন্যায় মিটে যাবেই। সত্যের জয় অবশ্যরিত।

আমার প্রেরিত দূতের সঙ্গে এখানে এসে আপনি দেখা করেও যেতে পারেন। আপনাকে সসমানে নিয়ে আসা হবে এবং সাক্ষাতের পর নিরাপদে নিজের বাড়ীতে পৌঁছে দেয়া হবে।

আত্মাহ তায়ালার এক নগণ্য গোলাম

মুহাম্মদ জালালুদ্দিন।

রামদাস চিঠিখানা পড়া শেষ করে দূতের মুখের দিকে তাকাল। তাঁর সুন্দর চেহারায় খনকানো দাঁড়ি। মাথায় পাগড়ী, কোমরে তরবারি ঝুলছে। মিষ্টি হাসিখানা ঘেন মুখে লেগেই রয়েছে। দূত জিজ্ঞেস করল, “পড়া শেষ হয়েছে?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“কি তার মত?”

“দু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?”

“করুন।”

“আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?”

“সুদূর আরব থেকে আমাদের কাফেলা আত্মাহর বাণী বহন করে দেশ বিদেশে বের হয়ে গেছে। আমরাও এদেশে ইছলামের দাওয়াত নিয়ে এসেছি। আমাদের নিকট খবর পৌঁছল যে, সিলেটে জনৈক অত্যাচারী রাজা আত্মাহর বান্দাদের ওপর চরম জুলুম করছে। এই খবর শুনে আমরা কতিপয় নিরস্ত্র ধর্ম প্রচারক এখানে এসে পৌঁছোছি।”

“আপনাদের ধর্মের বাণী কি?”

“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রসুল্লাহ” অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মনিব, মালিক উপাস্য ও সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নেই। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারিই বাণীবাহক।

“একথার তাৎপর্য কি?”

“সমগ্র বিশ্ব-জগতের সৃষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক ও একমাত্র মনিব হচ্ছেন আল্লাহতায়াল্লা, মানুষের উপর মানুষের কোন কর্তৃত্ব বা স্বেচ্ছা নেই। সকল মানুষই তার সৃষ্ট এবং তারা পরস্পর তাই তাই। মানুষ শুধু আল্লাহকেই বড় মনে করবে, কোন মানুষকে নয়। মানুষ শুধু তারিই আদেশ নির্বেধ মেনে চলবে, অন্য কারো নয়। মানুষ শুধু তারিই নিকটে মাথা নত করবে, অন্য কারো নিকটে নয়। আর হজরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে জীবন পরিচালনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই জীবন যাপন করার মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানব জাতিরকল্যাণ।

রামদাসের মনে হল, এ যেন এক নতুন কথা নতুন পথ। অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়ে আসছে নতুন সূর্যের আলোক রেখা। রামদাস বলল, “আমি আপনাদের রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাই।”

“তাহলে আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমাদের কোন রাজা নেই। আমাদেরই মত আল্লাহর একজন বান্দাই আমাদের সামীর বা আদেশদাতা। তার সঙ্গে সকলেই অবাধে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারে।”

রামদাস জিজ্ঞেস করল, “আমি তার সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসা পর্যন্ত এ শহরের শাসন কে চালাবে?”

“আপনি যে কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়ে যেতে পারেন।”

রামদাস অস্বস্তিকর পুনরায় শহরের দায়িত্ব অর্পণ করে সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের শাস্ত ভাবে তার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার নির্দেশ দিল। পরদিন দু’জন সিপাহী সঙ্গে নিয়ে রামদাস দূতের সঙ্গেই সিলেট শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

## বিয়াল্লিশ

শহরের নিকটবর্তী হেতেই রামদাস অনুভব করল, সমগ্র পরিবেশটাই যেন বদলে গেছে। শূদ্রসহ সকল উপজাতীয় লোকজন অবাধে শহরে প্রবেশ করছে। আবার অনেকে ফিরেও আসছে। কোথাও হিংসা বিদ্বেষের চিহ্ন মাত্র নেই। মুন্সে পরাজিত জাতির মনে বিজয়ীদের সম্পর্কে যে ভয়-ভীতি থাকে, তার লেশমাত্র সেই সবাই খুশী। রাজ চক্রবর্তীর পরাজয়টা কারোর কাছেই যেন দুঃখজনক হয়ে উঠেনি।

রামদাসের সঙ্গে কিছু সংখ্যক পরিচিত লোকেরও দেখা হল। তারা সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে। রামদাসের প্রশ্নের জবাবে তারা বলল, “এতদিন আমরা অন্ধকারে ডুবেছিলাম। এবার সত্যিকার সুখ, শান্তির সন্ধান পেয়েছি। আত্মাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আপনাকেও এ মহান দ্বন্দ্ব গ্রহণ করার শক্তি দান করেন।”

শহরের সর্বত্রই মানুষ অবাধে চলাফেরা করছে। কোথাও মুসলিম সৈনিকদের টহল দিতে অথবা নাগরিকদের হয়রানি করতে দেখা গেল না। পাগড়ী, কোর্তা ও পাঞ্জামা পরা যে সব মুসলমানদের সঙ্গে পথে দেখা হল, তাদের খুবই তন্ত, শিট ও সাদাসিদা মানুষ মনে হল। তারা রামদাসের সঙ্গী দৃতকে “আসসালামু আলাইকুম” বলে শুভেচ্ছা জানাল। রামদাস সঙ্গীকে প্রশ্ন করে এটির অর্থ ও উদ্দেশ্য জেনে নিল। তার নিকট এ ব্যবস্থাটাও খুব ভাল মনে হল।

আমর খানার নিকটস্থ একটি টুটু টিলার নিচে গাছপালার ছায়া খেরা একটি স্থানে বহুলোক জমায়ত হয়েছিল। রামদাসকে নিয়ে দূত টিলার উপরে একটি ভাবুতে পৌঁছল। সেখানে চাটাই বিছিয়ে কয়েকজন লোক বসে কথা বলছিলেন। দূত সেখানে পৌঁছে “আসসালামু আলাইকুম” বলল, “ওহা আলাইকুমুসসালাম” বলে যিনি জবাব দিলেন তিনি উপবিষ্টদের মধ্যে সব চাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ। সুন্দর চেহারা থেকে যেন আলোর জ্যোতি বেরিয়ে আসছে। চোখ দুটি উজ্জ্বল। মাথায় সুন্দর করে চিরনী করা বাবরি চুল। গায়েরপরা কোর্তা। পরিধানে একখানা সাধারণ লুঙ্গী। তিনি বললেন, “আপনি কোথায় গিয়েছিলেন, তাই আবদুল্লাহ?”

“বৌকানু গিয়েছিলাম। সেই শহরের নগরপতি রামদাস আমার সঙ্গে রয়েছেন।”

“কবে গিয়ে আসুন।”

আবদুল্লাহর ইঙ্গিতে রামদাস ভাবুতে প্রবেশ করে দু’হাত কপালে ঠেকিয়ে আমীরের উদ্দেশ্যে সালাম করল। আমীর সাহেব এগিয়ে এসে তাকে হাত ধরে চাটাইয়ের উপর

বসালেন। তাবুতে আমীরের সঙ্গে যারা এতক্ষণ কথাবার্তা বলছিলেন, তারা অন্য তাবুতে চলে গেলেন।

আমীর পরম দরদ ও ভালবাসা নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কেমন আছেন?”

“ভগবানের কৃপায় ভালই আছি।”

“যৌবনপূরের অবস্থা কি?”

“এখন স্বাভাবিক। প্রথম প্রথম কিছুটা ভয়-ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। কারণ, আগে বিজয়ীগণ পরাজিতদের সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করতো। আপনার দৃষ্টির কথাবার্তা শুনে ও চালচলন দেখে সবাই আশস্ত হয়েছে। আমি ফিরে যাবার পূর্ব নগরবাসী আমার মতামত শোনার পরই আমরা কর্তব্য স্থির করবো।”

“আপনি কোন বিষয়ে আলোচনা করতে এসেছেন?”

“আমি জানতে এসেছি, আপনাদের পররাজ্য দখল করার উদ্দেশ্য কি?”

“আমরা কারো রাজ্য দখল করতে আসিনি। মানুষের উপর শাসন দত্ত কায়ম করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কেননা, শাসন করা আল্লাহ্ তায়ালারই এখতিয়ারকৃত। আমরা আল্লাহর ঘোঁসের বাণী প্রচার করে বেড়াই। মানুষকে ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরিয়ে এনে কল্যাণের পথ দেখিয়ে দেই। কোন অত্যাচারী শাসক যদি দেশবাসীর উপর নির্ধাতনমূলক শাসন চালায়, তাকেও আমরা এই কাজ থেকে বিরত করার চেষ্টা করি। যদি সে জুলুমের পথ পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে অপসারণ করা ছাড়া উপায় কি?”

“আপনাদের ধর্মানুসারে এ রাজ্যে অমুসলিমদের কি কি নিরাপত্তা দেওয়া হয়?”

“তারা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে। তাদের ধন-সম্পদ ও মান-ইজ্জতের পূর্ণ হেফাজত করা হবে। তবে যেহেতু তারা জুলুম মূলক শাসন চালায়, এ জন্য তাদের শাসন করতে দেয়া হবে না।”

“আপনাদের নিকট কি অমুসলিমরা অপবিত্র? তাদের স্পর্শ করতে আপনাদের ধর্মে কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?”

“সকল মানুষই আল্লাহর সন্তান। তাদের দেহ কখনও অপবিত্র হতে পারে না। তারা যদি অন্যায় ও অসত্য পথে জীবন যাপন করে তাহলে তাদের সে নীতি পরিত্যাগ। তারা নিজেরা ত্যাগ করবে, যে মুহূর্তে তারা অন্যায় নীতি ত্যাগ করবে, সে মুহূর্তেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।”

“যেসব লোক চাকরী, রজক, চর্মকার, কর্মকার ইত্যাদি পেশা গ্রহণ করেছে, তাদের মান-মর্যাদা স্পর্শক্ৰমে আপনাদের ধর্ম কি বলে?”

“আমাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা নেই। সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে হলে বিভিন্ন পেশার লোক পরকার। বিশেষ পেশা গ্রহণ করার দরুন মানুষের মান-মর্যাদা কমে না। আল্লাহর সৃষ্টিতে সকলেই সমান। অবশ্য পরকালে সৎ লোকদের পুরস্কৃত করা হবে আর অন্যায়কারীদের দেয়া হবে শাস্তি।”

“আল্লাহ্ এবং ভগবান কি অতির নয়?”

“আল্লাহ্, ইশ্বর বা ভগবান ইত্যাদি শব্দের পার্থক্যটা তেমন কিছু নয়। তবে আপনারা যাকে ইশ্বর বা ভগবান বলেন তারি স্ত্রী পুত্রাদি আছে তাবা হয়। তাই তিনি মানবীয় দুর্বলতার উর্ধে নন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌তায়ালার স্ত্রী পুত্র বা কন্যা হবার যোগ্যতা কোন সৃষ্টির নেই। সৃষ্টি সৃষ্টির সমকক্ষ হবে কি করে? নিরাকার সর্বশক্তিমান আল্লাহের সঙ্গে এরূপ নিকট সম্পর্ক কল্পনা করা তারি বিশালত্বকে খর্ব করা ছাড়া আর কিছুই নয়।”

“আমি দিন দুয়েক এখানে থাকতে চাই। অনুমতি পাব কি?”

“অবশ্যই। আমাদের মেহমানখানায় অমুসলিমদের জন্য একটি পৃথক বিভাগ রয়েছে। ব্রাহ্মণ পাচকেরা সেখানে রান্না ও খাবার পরিবেশন করে। আপনি কক্ষনে সেখানে থাকতে পারেন।”

আমীরের ইচ্ছিতে আবদুল্লাহ্ রামদাস ও তারি দুইজন সিপাইকে মেহমানখানায় নিয়ে গেল। রামদাস কিছুক্ষণ বিরাম করার পর জোহরের নামাজের আখান হলে মুসলমানরা ঐ সময় কি কি করে তা দেখার জন্য সেখানকার মনার সিঁড়ি থেকে রওনা হল। সবুজ মাঠে লোকজন পচ্চিমুখী হয়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। আমীর সাহেব এসে সকলের সম্মুখভাগে দাঁড়ানোর পর নামাজ শুরু হয়ে গেল। রামদাস অবাক বিষয়ে দেখতে গেল, সকল মুসলমানই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাজের জন্য দাঁড়িয়েছে। উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র সকলে মিলে একটি মাত্র দলে পরিণত হয়েছে। কারো প্রতি কারো বিবেচ নেই। কেউ অপরকে উপাসনার যোগ দিতে বাধা দিচ্ছে না। সকলে একযোগে একজন মাত্র নেতার অনুসরণ করে মহান আল্লাহর উপাসনা করছে। কি সুন্দর সে দৃশ্য! সাম্য, মৈত্রী ও সমানস্বিকারের এমন বাস্তব দৃশ্য ইতিপূর্বে কখনও সে দেখতে পারনি। রামদাসের মহারাজাকে সৈন্য সৈনিক যুদ্ধে পরাজিত করেছেন, তারিও এ দলে রয়েছেন। আবার যারা সবেমাত্র ইসলাম কবুল করেছেন, তারিও আছেন। তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মহান আল্লাহর দরবারে এসে সকল মুমীন তাই তাই হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। নামাজ শেষে আমীরের সঙ্গে হাত উঠিয়ে সৃষ্টির দরগায় তাদের অপরাধ ও দোষত্রুটির জন্য তারা কমা প্রার্থনা করল। এ অপূর্ব দৃশ্য রামদাসের মনে গভীর রেখাপাত করল।

নামাজের পর আমীর সাহেব নিজের জায়গাতেই ঘুরে বসলেন। নামাজীদের মধ্য থেকে বেশ কিছু সংখ্যক লোক একের পর এক নিজেদের নানাবিধ অনুবিধার বিষয় আমীরকে জ্ঞাত করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এসব অসুবিধার প্রতিকার করার জন্য সর্গশ্রী কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন। মাঠের এক পাশে বহু অমুসলিম দাঁড়িয়ে ছিল। আমীর তাদের নিজস্ব আসার জন্য ইশারা করলে তারা সবাই ছুটে এল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “আপনারা কি কিছু বলতে চান?”

জনৈক হিন্দু চাষী করছোড়ে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করল যে, মৃত রাজা ঐ চাষীর পুত্রকে হিন্দী অপরাধে কারাগারে নিক্ষেপ করলে, সে এখনও তার পুত্রের কোন সন্ধান

পায়নি। আমীর কারাগারের ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে কয়েদীর পরিচয় জেনে নিয়ে তাঁকে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

একজন শূন্য বলল, “আমার বাড়ী নদীর ঐ পাড়ে। রাজার সৈনিকেরা বিনা কারণে আমার বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে নিয়ে পরু বাছুর লুটপাট করে নিয়ে গিয়েছে। দু’বছর যাবৎ তাই আমি বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আমীর বললেন, “আপনার বাড়ী তৈরী করে দেয়া হবে এবং লুটপাট পণ্ডপির জায়গায় নতুন পশু ক্রয় করার জন্য আর্থিক সাহায্যও দেয়া হবে।”

এক বৃদ্ধা মেথরাণী বুক চাপড়ে চীৎকার করতে করতে জ্বলছে আর বলছে, “বাবাজী জালাল কোথায়? আমি তার কাছে বিচার চাই।” আমীর তাকে দেখেই পরম মমতা সহকারে বললেন, তাকে আমার কাছে পৌছিয়ে দাও। কঠোরত ব্যবস্থাপকগণ বুড়ীর হাত ধরে তাকে আমীরের নিকটে নিয়ে এলো। বুড়ী ব্রহ্মল, “তুমিই নাকি বাবা জালাল।”

তিনি বললেন, “হ্যাঁ মা! বলো তোমার কি সাহায্য সরকার?”

বুড়ী বলল, আমার এক ছেলে ও এক মেয়েকে রাজা গোবিন্দ হত্যা করেছে। আমি তার বিচার চাই। তাদের অপরাধ তারা ভগবানের প্রার্থনা করে পান পাইছিল। রাজার সৈনিকেরা তন্তে পেয়ে তাদের ধরে নিয়ে যায়। তারপর রাজা তাদের মুখে গলানো সীসা ডেলে দেয়ার আদেশ দেয়। আমার আর কোন সন্তান নেই। তুমি বাবা দয়ার সাগর। এ অন্যান্যের বিচার কর।

আমীর জালালুদ্দিন বললেন, “মা, তোমার সন্তান তো আর ফিরে আসবে না, আমরা সবাই তোমার সন্তান। সরকারী তহবিল থেকে তোমার সকল খরচপত্র বহন করা হবে। আর তোমার দেখাশুনা করার ব্যবস্থাও আমি করব।”

বুড়ী বলল, “তুমি মানুষ নও বাবা! সাক্ষাৎ দেবতা!”

আমীর বললেন, “না, না, তুমি কথা বলোনা, মা। আল্লাহ্ নারাজ হয়ে যাবেন।”

পার্শ্বে দাঁড়ানো এক হিন্দু শিক্ষক বলে উঠল, “আপনি যেমন দরদ ও ভালবাসা প্রকাশ করছেন, তা শূন্য দেবতাদের নিকটই আশা করা যায়।”

আমীর বললেন, “আমি একজন সাধারণ মানুষ। আল্লাহ্ তায়ালার এক অতি নগণ্য গোলাম। আমি আল্লাহরই হুকুম মূর্তাবিক সবকিছু করছি। তিনি রহমানুর রাহীম। তাঁর সৃষ্টিকে তিনি যে কত ভালবাসেন তার পরিমাণ নির্ণয় করা অসম্ভব। তাঁর সবুটি অর্জন করার জন্যই আমি তাঁরই সৃষ্ট মানুষের সেবা করার সামান্য প্রয়াস পাচ্ছি মাত্র।”

এ সময় রামদাস দস্তায়মান হলে আমীর বললেন, “হ্যাঁ, বলুন, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?”

রামদাস বলল, “আমার বিশ্বাস আপনি ভগবানের বিশেষ দূত। আপনাকে যারা দেবতার সঙ্গে তুলনা করছে তারা নেহায়েৎ তুল করছে। দেবতা কখনও মানুষকে

ভালবাসার শিক্ষা দেয়নি। দেবতা তো মানুষে মানুষে বিতর্কের প্রাচীর খাড়া করেছে মাত্র। আমার বিবেচনায় দেবতার চেয়ে মানুষই বড়। আর আপনি হচ্ছেন সত্যিকার মানুষ।”

আমীর সাহেব বললেন, “ব্যক্তির কোনই কৃতিত্ব নেই। স্বয়ং আল্লাহুতায়ালাই তাঁর সৃষ্ট মানুষকে ভালবাসার আদেশ দিয়েছেন। দেবতা হওয়ার কোন প্ররই গুণে না। মানুষ কখনও দেবতা হতে পারে না। জ্ঞান ও চরিত্রে উন্নত হলে তিনি আদর্শ স্থায়ী মানুষ হতে পারেন, দেবতা নয়। আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব জাতির পথ প্রদর্শক হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তিনিও মানুষ। তাঁকেও দেবতা মনে করা পাপ।”

রামদাস এই সব দেখে শুনে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব দিল। আমীর তাকে সাদরে ইসলামের সুশীতল আশ্রয়ে আহ্বান জানালেন। রামদাস ইসলাম গ্রহণ করলে তার নামকরণ করা হল আবদুর রহমান। তার সঙ্গী সিপাই দু'জনও দীক্ষা গহণ করল। তারপর উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে বহু অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করল। আবদুর রহমানের অনুরোধে আমীর মুহাম্মদ জালালুদ্দিন যৌবনপুরে ইসলাম গ্রহণেচ্ছুদের শিক্ষাদানের জন্য জনৈক জগন্মুখে আবদুর রহমানের সঙ্গে সেখানে যাবার নির্দেশ দিলেন এবং আবদুর রহমানকেই সে শহরের নগরপতির পদে বহাল করলেন। আবদুর রহমান আরও দু'দিন আমীরের সংসর্গে রইলো এবং জরুরী অনেক কিছু শিখে নিয়ে যৌবনপুরের উদ্দেশ্যে একদিন রওনা দিল।

## তেতাল্লিশ

আবদুর রহমান যৌবনপুরে পৌঁছলে অশেখমান নগরবাসী তার বেশভূষার পরিবর্তন দেখে আশ্চর্যবিত হয়ে গেল। অর্জুন তার পুরাতন বস্তুর সঙ্গে করমর্দন করার জন্য এগিয়ে এলো না। নগরপতির বিশাল বাড়ীতে জনসাধারণ ছুটে এসে জড় হতে লাগল। কিন্তু তাদের মনে দ্বিধা সংকোচ। নগরপতি তির ধর্মান্বলম্বন করেছে। পুরোহিত ঠাকুর ইতিমধ্যেই প্রচার করেছে যে, রামদাস স্রেষ্টি হয়ে গেছে। স্রেষ্টি মুসলমান অঙ্কুৎদের চাইতেও বেশী অপবিত্র। অবশ্য প্রচারণা চালাতে হয়েছে খুবই গোপনে। কারণ রাজ চক্রবর্তীর পরাজয় ও মৃত্যুর পর তাদের অবস্থা খুবই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

নগরপতির বাড়ীর সামনে যে খোলা চত্বরটি রয়েছে তাতে শহরের লোকেরা জড় হলে আবদুর রহমান তাদের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতায় বললঃ



আমার নগরবাসী ভাইয়েরা,

আমি আপনাদের জন্য এক সুসংবাদ বহন করে এনেছি। রাজ চক্রবর্তী যাদের হাতে পরাজিত হয়ে মুক্তাবরণ করেছে তারা কারো শত্রু নন। বরং তারা মানবতার পরম বন্ধু ও স্তম্ভাকাংক্ষী। তাদের পক্ষ থেকে কোন অত্যাচারের আশংকা নেই। রাজধানী শহুরে বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করছে। অবস্থা দেখে মনেই হয় না যে, সেখানে কখনো কোন যুদ্ধ হয়েছে। শহরের অধিবাসীদের মনে জম্মু ভীতির পরিবর্তে আনন্দ দেখা দিয়েছে। কারণ, তারা নবাবতনের নিকট অত্যন্ত মধুর ব্যবহার ও ন্যায় বিচার পাচ্ছে। সকল দীন-দুঃখী লোকদের তালিকা তৈরী করে তাদের আয় প্রোজেক্টের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে—তা আমি নিজ চোখেই দেখে এলাম। এ তালিকা প্রণয়ন কালে ধর্ম-গোত্র বা বর্ণের ভিত্তিতে কোন তারতম্য করা হয়নি। বিজয়ী বীরদের পরিচালক সংসারাসক্ত রাজা বা সম্রাট নন; তিনি এক তাপস ব্যক্তি, তার সঙ্গে আগত যোদ্ধাদের সকলেই এক একজন সাধক। তারা সারা দিন মানুষকে আত্মাহর মধুর বাপী শোনান, সংভাবে জীবনযাপন করার শিক্ষা দেন। আবার নামাজের বিছানায় দাড়িয়ে মহান আত্মাহর নিকট অনিচ্ছাকৃত দোষত্রুটিগুলোর জন্য ক্ষমা চান। সে সময় তাদের চোখের কোণ থেকে স্নেহ আসে অশ্রু বন্যা। ইসলামের নিবৃত্ত ধর্ম বিধান এবং মুসলমানদের চরিত্র মূর্খভাবে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তাই নিজেকে আত্মাহর নিকট সমর্পণ করে ঐ মহান লোকটির সঙ্গে শামিল হয়েছি। আমীর সাহেব আমাকে নগরপতির পদে বহাল রেখেছেন। আপনাদের উপর কোন চাপ নেই। যারা ইচ্ছা করেন, তারা ইসলাম কবুল করে নিজে থাকেন। আমাদের শিক্ষাদানের জন্য একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি কষ্ট স্বীকার করে এখানে এসেছেন এবং কিছুকাল থাকবেন। যারা পৈতৃক ধর্মে থাকতে ইচ্ছুক, তারা অবশ্যে বিজ্ঞ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবেন। কিছু আইন ও শাসন চলবে আত্মাহর। রাজ থেকে কেউ অস্পৃশ্য বিবেচিত হবে না। শূদ্রদেরও শহরে বসবাস ও যাতায়াত করার পূর্ণ অধিকার থাকবে। কেউ তাদের এ অধিকারে বাধা দিতে পারবে না। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বৈধ উপায়ে আয়-উপার্জন করার সকলেরই সমান অধিকার থাকবে। কারো সম্পত্তিতে অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। নিজ নিজ উপাসনালয়ে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরা পূজা-পার্বনের অধিকারও থাকবে। কেউ ফেঙ্কায় ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলে বাধা-দানের অধিকার কারো নেই। আমি আবার বলছি, আসুন আমরা সকলে মিলে আত্মাহর দেওয়া দীন ইসলাম গ্রহণ করে ইহকাল ও পরকালের সুখ শান্তির পথ খোলাসা করি। যারা এ দাওয়াত গ্রহণ করবে না, তারা খালি প্রিয় ও আইনানুগত নাগরিক হিসেবে বসবাস করুন। হিসো, চক্রান্ত, পরের সম্পদ অপহরণ ও মানুষকে হেয় করে রাখার অপচেষ্টাকারীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।”

কিন্তু শেষে আবদুর রহমান আসন গ্রহণ করল পুরোহিত ঠাকুর দাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, “আমাদের মন্দির ও পূজার্তনার নিরাপত্তা থাকবে তো?”

আবদুর রহমান বলল, "সে কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। কারো ধর্ম পালনে বাধা দেয়া হবে না। কেবল মাত্র ধর্ম পালনের নামে অপরের ধর্মে হস্তক্ষেপ অথবা তাদের ধর্মকার্যে বাধাদান করা চলবে না।"

পুরোহিত পুনরায় বলল, "মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য আমরা কোল কোল সপ্তদায়ের লোকদের মন্দিরে প্রবেশ করতে দেই না। আমাদের সে অধিকার বহাল থাকবে কি?"

আবদুর রহমান বলল, "যাদের মন্দির তারা যাদের বাধা দিবে তারা ঐ মন্দিরে যেতে পারবে না। কিন্তু যাদের বাধা দেয়া হবে, তারা যদি পৃথক মন্দির স্থাপন করতে চায়, তাহলেও কেউ তাদের মানা করতে পারবে না।"

পুরোহিত ঠাকুরের মুখখানা শুকিয়ে গেল। সে শংকরকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। তাদের সঙ্গে আরও কিছু লোক উঠে গেল। এদিকে আবদুর রহমান বলল, "আমার বাল্যবন্ধু রামদাসকে আমি চিরদিনই বিচক্ষণ ও ন্যায়নিষ্ঠ মনে করি। তারি মুখ থেকে পবিত্র ইসলামের বিষয়ে যা যা শুনতে পেলাম, তা আমাকে ঐ ধর্ম গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। আমি ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত। কিভাবে গ্রহণ করবো তা আমাকে শিখিয়ে দেয়ার জন্য আমি তাকে অনুরোধ করছি।"

চারদিক থেকে আগ্রাসক উঠলো, "আমরাও মননবধর্ম ইসলাম গ্রহণ করব।"

আমীরের প্রেরিত আলেম সাহেব সকলকে কালেমায়ে শাহাদাত পড়িয়ে দিলেন এবং ঐদিন থেকেই তাদের ইসলামের জরুরী বিষয়গুলোর শিক্ষা দেয়ার জন্য রীতিমত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হল। পুরুষদের নির্দেশ দেয়া হল যে, তারা ঐ প্রতিষ্ঠানে যা' যা' শিখবে, বাড়ীতে ফিরে গিয়ে স্ত্রীলোকদের তা শেখাবে। পরের দিন শহরের নিকটের বস্তিগুলো থেকে অগণিত নর-নারী ও মেলেমেয়ে শহরে এসে ইসলাম কবুল করতে শুরু করল।

যুগ যুগ ধরে যারা ছিল অশিক্ষা, লাহিত ও পদনলিত তারা আজ মুক্তির সন্ধান পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। যে আল্লাহ তাদের সৃষ্টি ও প্রতিপালক, যিনি তাদের ঘৃণ্য জীবন যাপন থেকে উদ্ধার করার জন্য এক মহান মুক্তিদাতাকে পাঠিয়েছেন, সেই নিরাকার ও সর্বশক্তিমান পরম সুরাশু আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশে সিজদা করে তারা পরম জুজলাত করল। তাদের সকল অভাব মিটে গেল। "দেবতাদের" সমাজ ছেড়ে তারা মানুষের সমাজে মিশে হারানো মর্যাদা ফিরে পেল। এ সমাজে কেউ কারো দাস নয়, সবাই একমাত্র আল্লাহর দাস এবং সকলে পরস্পরের ভাই। সাম্যের মহান বাণী যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত সকল গ্রানি ধূয়ে মুছে দিয়ে এক পবিত্র ও তেজোভেদহীন সমাজের জন্মদান করল। সুবশ্য পুরস্কৃত ঠাকুর, শংকর ও মুষ্টিমেয় কিছু লোক প্রাচীন ধর্ম অতিকড়ে রইল। এদিকে যৌবনপুরের চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়ে নতুন জৌলুসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

## চুয়াল্লিশ

রামদাসেরই উপদেশ অনুসারে কমল দলবলসহ পূর্বনিগের একটি পাহাড় অতিক্রম করে উপত্যকার অপর পার্শ্বের পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছল। উঁচু নীচু পাহাড় গুলি ও টিলা সমন্বিত এ পাহাড়ের স্থানে স্থানে অনেকগুলো ছোট ছোট কুটির দেখা যায়। অনেকগুলো পোষা ভেড়া, বকরী ও গাধা সেখানে চরে বেড়াচ্ছে। পাহাড়টির উত্তর প্রান্তে বেশ একটা সমতল জায়গা দেখে কমল বলল, আমাদের থাকার স্থান নির্ধারণ করতে হবে। তারবাহী পশুগুলোকে দীর্ঘ করিয়ে তেজু ও লালু মালপত্র বন্টন শুরু করল। ঝোপ-ঝাড়ের ভিতরের ছোট ছোট কুটিরগুলো থেকে পুরনু, নারী ও ছেলেমেয়েরা ছুটাছুটি করে নবাগত দলটিকে দেখতে এলো। বয়স্কদের অনেকেই তেজুকে চিন্তে পেয়ে কুশল বার্তাদি বিনিময় করল। তার নিকট সাধন সরদারের কন্যা কমলের এবং সুখসেবের ছেলে মাধব ও কন্যা শান্তার পরিচয় পেয়ে তারা সকলেই কুটির তৈরীর সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে লেগে গেল। মেয়েরা তাদের কুটির থেকে নানাবিধ ফল মূল নিয়ে এসে নবাগতদের খাবার ব্যবস্থা করল। পাহাড়ের নীচেই একটি ঝরনা ছিল। লালু কলসী ভরে সেখান থেকে পানি নিয়ে এলো। ঝরনার আগেই চারখানা ঘর তৈরী হয়ে গেল। শান্তা ও মোহিনী দু'জনে মিলে বিকালের খাবার তৈরী করে ফেলল। লালু ইতিমধ্যেই কয়েকটি বনমোরগ এবং একটি হরিণ শিকার করে এনেছিল। রাত্রিবেলা খাবার পর পরিবারে সকলে ঘরের সামনে বোঁটা জায়গায় বসল। পাহাড়ী বাসিন্দারাও গল্প শুভব করতে এলো। তেজু তাদেরকে সকল বৃত্তান্ত জানাল। তাদের মধ্য থেকে জগু নামক জনৈক বৃদ্ধ বলল, "তেজু ছাই! আমাদের কোন সরদার নেই। আমি তোমাদের মধ্যে সব চাইতে বেশী বয়সের মানুষ। সেজন্য সকলে আমাকে সরদার বলে মানে। অবশ্য আমাকে কেউ কোন দিন সরদারের দায়িত্ব দেয়নি। যৌবনপুর থেকে পাগিয়ে আসার সময় আমারই পরিচালনায় তারা এখানে এসেছিল, তারা স্বাভাবিক ভাবেই আমারই উপদেশ ও পরামর্শে সকল কাজ করতে থাকে। আমি অন্য কোন যোগ্য লোকের অবর্তমানে এদের আদেশ উপদেশ দিচ্ছি। কিন্তু আজ আমাদের মধ্যে সাধন সরদারের কন্যা কমল এসেছে। আমার প্রস্তাব কমলই এখন থেকে আমাদের এ গ্রামের নেত্রী হবেন।"

কমল বলল, "জগু কাকা! আমি তোমার সন্তান ছুঁয়া। আমাকে তোমার এসব বিষয়ের সঙ্গে জড়িত করোনা না। আঘাতের পর আঘাত খেয়ে আমার মন মগজ এখন

আর সুস্থ নেই।”

জগু বলল, “তাহলে বাচ্চা! সুখদেবের পুত্র মাধবকে আমরা সরদার মনোনীত করতে পারি?”

মাধব বলে উঠল, “কি বলছেন জগু দাদা! আমি নেহায়েত ছেলে মানুষ। আমার তো এখনও বুদ্ধিসুদ্ধিই হয়নি।”

অপর একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিতাই বলল, “মাধব! সুখদেবও ছেলে মানুষই ছিল। কিন্তু তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও চরিত্র উন্নত ছিল। আমরা আজও তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তুমি তারই ছেলে। আমরা তোমাকে সুখদেবেরই মত গুণজ্ঞানের অধিকারী বলে বিশ্বাস করি।”

মাধব বলল, “যদি তোমরা আমার কথাই কোন মূল্য দিতে রাজী থাক, তাহলে আমি একজন যোগ্য লোকের নাম প্রস্তাব করতে পারি।”

সকলে সম্মত হয়ে বলে উঠল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমার কথা মেনে নিতে আমাদের কোনই আপত্তি নেই।”

মাধব বলল, “তোমরা বোধহয় স্মরণে পেরেছ যে, মৌবনপুর বর্তমানে একটি বড় শহরে পরিণত হয়েছে এবং ঐ শহরের নগরপতি হচ্ছেন আমার বাবার বন্ধু রামদাস। তিনিই একসময় আমার মাতা ও পিতাকে রাজার কারাগার থেকে উদ্ধার করেছিলেন। নগরপতি হয়ে তিনিই শূত্রদের প্রতি অত্যাচারের আইন রদ করেছেন। এখন আর রাজার সৈন্যদল শূত্রদের বাড়ী-ঘর জ্বালাতে ও লুণ্ঠিত করতে আসে না। সেই রামদাসেরই একমাত্র পুত্র রনবীর নিজেদের সমাজ থেকে আমাদের সমাজে চলে এসেছেন। তিনি নগরপতির তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হয়েছেন বিধায় তার জ্ঞান আমার চাইতে অনেক বেশী। তাছাড়া, তিনি সাহসী, বিচক্ষণ ও হৃদয়বান। তোমরা আমাকে সরদার মনোনয়নের দায়িত্ব দিয়েছ। আর আমি ঘোষণা করছি যে, রনবীরই আজ থেকে আমাদের সরদার হোক।”

রনবীর আপত্তি করে কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু সমবেত আনন্দ ধ্বনিতে তার স্বর চাপা পড়ে গেল।

ততক্ষণে উপস্থিত রনবীর সকলেই রনবীরের নামে জয়ধ্বনি দিতে শুরু করেছে। লালু কোথা থেকে ছুটি এসে হরেক রকম বনফুল নিয়ে গীথা মালা তার গলায় পরিয়ে দিল।

মাধব ও তেজু সকলকে শান্ত করে বলল, “সরদার কিছু বলতে চায়। আমাদের তার কথা শোনা উচিত।”

উপস্থিত সকলে নীরব হলে রনবীর বলতে শুরু করল, “উপস্থিত ভাইসব! তোমরা সকলে মিলে বা সিদ্ধান্ত করবে, তা মানতে আমার আপত্তি নেই। তবে দু’টো বিষয়ের প্রতি তোমাদের নৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমতঃ আমি তোমাদের সম্প্রদায়ের লোক নই। আমি এমন এক সমাজ থেকে এসেছি, যেখানে তোমাদের মানুষ বিবেচনা করা

হয় না। আমাকে আগে তোমাদের সঙ্গে মিশে যেতে দাও। দ্বিতীয়তঃ আমার বয়স নিতান্ত কম। তোমরা অনেকেই আমার বাবার বয়সের লোক। তোমাদের জ্ঞানবুদ্ধি আমার চেয়ে অনেক বেশী। এমতাবস্থায় আমি কি করে তোমাদের নেতৃত্বের দায়িত্বভার নিতেপারি।

জগু বলল, “আমরা সব কথা জেনে শুনেই তোমাকে আমাদের সরদার মনোনীত করেছি। সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হবে না। সকলেই বলে উঠল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমিই আমাদের সরদার। আমরা কোন গুজর আপত্তি শুনবো না।”

কমল বলল, “জগু কাকা! তোমাদের সরদার নির্বাচন শেষ হল। এবার আমার একটা কথা শুন। আমার একমাত্র কন্যা শান্তাকে আমি রনবীরের হাতে সমর্পণ করব। আর আমার একমাত্র পুত্র সন্তান মাধবেরও বিয়ে দেব। কখন আমার সঙ্গেই নিয়ে এসেছি। তোমরা কাল সবাই আসবে। নিমন্ত্রণ রইল। সবাই প্রসন্ন আনন্দ ছানি করল। তারপর সে রাতের মত সকলে যার যার কুটিরে চলে গেল।

পরদিন সকালেই গ্রামের যুবক ছেলেরা শিকারে বের হয়ে গেল এবং সামান্য বেলা উঠার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি হরিণ ও পাখী শিকার করে নিয়ে এলো। শুদিকে মেয়েরা রান্নার লেগে গেল। দুপুরে সকলে হাসি খুশী সহকারে ভূনা গোল্ড ও ভাত রুটি মিলিয়ে বিয়ের ভোজপর্ব সমাধা করল। অপরাজিত পুনরায় গ্রামের সকল পুরুষ, নারী ও ছেলেমেয়েরা সরদারের বাড়ীর পার্শ্বে জমায়ের হল। কমল মোহিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে এক পার্শ্বে ঘাসের তৈরী একটি চামড়ায় বসিয়ে দিল। তারপর মাধবকে তার পার্শ্বে বসিয়ে বলল, “মাধব! মোহিনী উচ্চ জাতের মেয়ে। মাতা-পিতার একমাত্র আদরের দুলালী! সে তোমারই জন্য মস্তাপিতাকে ছেড়ে এই জংগলে চলে এসেছে। আমি ভগবানকে সাক্ষী করে এ মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। বল, তুমি তার মর্যাদা রক্ষা করবে?”

মাধব কল্পিত কণ্ঠে বলল, “হ্যাঁ। আমি ভগবানকে সাক্ষী করে বলছি! মোহিনীকে আমি কখনও অমর্যাদা করবোনা।”

কমল মোহিনীর ডান হাত বানি মাধবের হাতে তুলে দিলে মাধব তার হাত ধরে নিয়ে কুটিরে চলে গেল। এবার কমল শান্তাকে একই ভাবে নিয়ে এসে রনবীরের হাতে তুলে দিয়ে বলল, “ভগবানকে সাক্ষী করে আমি শান্তাকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি।”

রনবীরও তার হাত ধরে বলল, “মা ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, আমি কখনো শান্তার মর্যাদা হানি করব না।”

অর্জুনের নতুন নামকরণ করা হয়েছে আবদুর রহীম। যৌবনপূরের বাসিন্দাগণ নয়া ব্যবস্থা মূর্তাবিক জীবন-যাপনে কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে উঠলে আবদুর রহমান ও আবদুর রহীম চারজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের দিকে রতনা হল। বর্তমানে জাহাঙ্গীর নামে পরিচিত সাবিত্রীও তাদের সঙ্গে চলল। সেলিম নামক জনৈক নবনীকিত শিক্ষিত যুবকের উপর নগরপতির দায়িত্ব অর্পণ করা হল। দু'দিন ঘোড়ার পিঠে কতানোর পর দুজনের একটি পাহাড়ের এক প্রান্তে কয়েকটি কুটির দেখা গেল। কিন্তু পাহাড়ী পথে ছুরাধুরি করে সেখানে পৌঁছতে সম্ভা হয়ে গেল। কুটিরগুলোর নিকটবর্তী হতেই জন কয়েক পাহাড়ী যুবক তাদের পথরোধ করে দাড়িয়ে বলল, 'তোমরা কে, কোথা হতে, কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ?'

আবদুর রহমান জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের সরদারের নিকট কি?"  
তারাবলল, "রনবীর"

আবদুর রহমান বলল, "আমরা তোমাদের সরদারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

এ সময় একটি ছেলে নিকটে এসে বলে উঠল, "জাপনাকে তো আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে হয়। কিন্তু এ ধরনের কাপড়-চোপড় পরা লোক তো আগে দেখিনি। গলায় স্বর হুবহু সরদারের বাবার মত। কিন্তু তাঁর শোশাক তো এরূপ ছিল না। তিনি যৌবনপূরের নগরপতি।"

আবদুর রহমান নিকটে গিয়ে ছেলের মস্তক হাত দিয়ে বলল, "তুমি দেখছি লালু! আমিই যৌবনপূরের নগরপতি। চিন্তে পড়েছি না? শোশাকটা বদলী করেছি মাত্র।"

লালু উচ্চস্বরে বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ চিন্তে পেরেছি।"

সে ঘোড়ার বাগ ধরে বলল, "নেয়ে আসুন।"

চারদিকে যারা দাড়িয়েছিল তারাও এসে অন্যান্য অতিথিদের ঘোড়া ধরল। এদিকে গোলমাল শুনে রনবীর বিষয়টা কি দেখতে এলো। বিষয়ান্তিত হতেই, "বাবা!" বলে আবদুর রহমানের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। ওদিকে লালু হৈ ছত্রোড় করে কমল, মাধব, শান্তা, মোহিনী সকলকে অতিথিদের আগমনের খবর জানিয়ে দিল। অতিথিরা কুটিরের দিকে যাচ্ছিল আর ওদিক থেকে কমল, মাধব, মোহিনী, শান্তা তাদের দিকে ছুটে এলো। মোহিনী মাঝের বুকে মুখ লুকিয়ে আনন্দ অশ্রু ফেলতে লাগল। মা বাবা দু'জনকেই এক সঙ্গে পেয়ে তার আঙ্গ আনন্দের সীমা নেই। অশ্রু ঢেলেই সে তার আনন্দ প্রকাশ করল।

কুটিরের নিকট গেলে মশাল জ্বালিয়ে দেয়া হল এবং খোলা উঠানে ঘাসের তৈরী চাটাই বিছিয়ে সকলেই তার ওপর বসে পড়ল। খবর জানাজানি হতেই পার্শ্বের টিলা ও কোণখাড় থেকে দলে দলে নরনারী ও ছেলেমেয়ে অতিথিদের দেখতে এলো।

কমল বলল, "দাদা! আপনারা তো সারাদিন কিছু খাননি সামান্য একটু বসে গল্প-গুজব করুন, আমি তাড়াতাড়ি কিছু খাবার তৈরী করে আনি।"

আবদুর রহমান ব্যস্ত হয়ে বলল, "না, না, আমরা খেয়েছি। আমাদের সঙ্গে এখনও

যথেষ্ট খাবার রয়েছে। সেজন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না, বোন।”

আবদুর রহমান, আবদুর রহীম, জাহানারা একের পর এক রনবীর, মাধব, শান্তা, মোহিনী, লালু, তেজু প্রমুখের কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করল। তাদের নিকটে বসিয়ে বার বার তারা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। রনবীর বলল, “বাবা! একটা কথা জিজ্ঞেস করতে বার বার ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু তোমাদের অসন্তুষ্টির ভয়ে বলতে পারছি না।”

ভয় কি? নিঃসংকোচে বল। কেউ অসন্তুষ্ট হবে না। সবকিছু বলা এবং শোনার জন্য ইতোএসেছি।”

“আপনাদের সকলেরই বেশ ভূয়া আশ্চর্য ধরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।”

“তুধু বেশ ভূয়া নয়। আমাদের মন মগজ ও জীবন ধারা সবই পুষ্টি পেছে বাবা। আমরা নতুন মানুষ হয়ে তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি। বলতে এসেছি যে, তোমাদের আর এ অজ্ঞাতবাসে থাকার প্রয়োজন নেই।”

“সব কথা খুলে বলুন, বাবা। আমরা সবাই আপনাদের কৃপা-শ্রমবার জন্য উনগ্রীব হক্টেছি।”

“রনবীর! বহুদিন থেকে আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে, মানুষে মানুষে হিংসা বিদ্বেষ এবং বিভিন্ন সৃষ্টিকারী ধর্ম ভগবানের ধর্ম হইবে পারে না। বিপুল সংখ্যক মানুষ মুষ্টিমেয় উচ্চ বর্ণের লোকদের দাসত্ব করণেও মানুষ হিসাবে বিবেচিত হবে না— এটা চরম নিষ্ঠুরতা। তাই ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পূজাপূর্বনে অনিচ্ছা সহকারে অংশ নিচ্ছিলাম। কারণ, এ ধর্মের অসারতা সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। সুখদেবকে যেদিন প্রাণদণ্ড দেয়া হয় এবং কমলকে তার চিত্তের অত্যন্ত পুষ্টিয়ে মারার সিদ্ধান্ত হয়, সেদিন আমার মন দৃঢ়ভাবে বলে ওঠে, এ ধর্ম আমার নীতি বর্জিত জিনিস। প্রস্তর ও মাটির দেবতা তৈরী করে ভগবানের নামে মানুষের উপর নির্ধাতন চালানো হচ্ছে মাত্র। আমি তাই বিপুমাত্র বিধা না করে সেদিন সুখদেব ও কমলকে মুক্ত করে দেই। রাজ চক্রবর্তী গোবিন্দজীও অত্যন্ত উদার হৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু পুরাতন পুণ্ডরীকের বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস তাঁর ছিল না। শূন্যের বশ করার জন্য তিনি যখন আমাকে দায়িত্ব দেন, তখন আমি বলেছিলাম কোন নিষ্ঠুর আচরণ আমার দ্বারা সম্ভবপর হবে না। তিনি আমাকে আমার অতিরিক্ত দায়িত্বকে কাজ করার পূর্ণ অধিকার দেন। আমি শূন্যের সঙ্গে মানবসুলভ ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য ধর্মের অনুশাসন মেনে যতটুকু করা সম্ভব।”

“নিয়তির এমনি প্রকৃত শীলা। সুখদেবেরই সন্তানেরা আবার ধর্মীয় বিধি-নিষেধের রশি ধরে টান মুঠায়। সমাজের ভয়ে আমি এবং মোহিনীর মাতাপিতা প্রাণপ্রিয় সন্তানদের বনবাসী হয়ে যেতে অনুমতি দিলাম। আমি নিজে এসে তোমাদের এখানে রেখে ফিরে যাবার পথে তুধুই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করছিলাম, তিনি যেন সভ্য প্রকাশ করেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল, এ ধর্ম-মানব সৃষ্ট ধর্ম। ধর্মের অনুশাসন রচনাকারী শূন্য সমাজের ঘাড়ে নিজেদের চাপিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই এসব ব্যবস্থা তৈরী করে দেবে। ভগবানের ধর্ম হবে সকল মানুষের জন্য।”

কিন্তু ফিরে গিয়ে জানতে পেলাম, “ইসলামের শান্তির পতাকা আমাদের রাজ্যের মধ্যেই উড়তীল হয়েছে। আরব দেশের মক্কা নগরীতে হজরত মুহাম্মদ সান্তাভ্রাহ

আলাইহি ওর সাল্লাম নামে আত্মাহর এক প্রেরিত পুরুষ জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আত্মাহরতায়াল। তিনিই মানুষ ও সকল জীবের অন্নদাতা ও প্রতিপালক। তিনিই একমাত্র মালিক, মনিব ও উপাস্য। মানুষ শুধু তাঁরই কাছে মাথা নত করবে, তাঁরই হুকুম মারফিক চলবে এবং তাঁকে ভয় করে জীবন যাপন করবে। সকল মানুষই আত্মাহর সৃষ্ট। তাই মানুষে মানুষে কোন তেজাতেন থাকতে পারে না। রক্ত, বর্ণ ও গোত্রের বিভিন্নতার দরুন মানুষ অপর মানুষের তুলনায় বড় কিংবা ছোট হয় না। যারা আত্মাহরতায়ালকে মেনে চলে ও সৎভাবে জীবন যাপন করে, তারাই উত্তম মানুষ। আর যারা তাঁকে অমান্য করে, তারা অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য। যারা হৃদয়তের এ ঘোষণা মুতাবিক আত্মাহর প্রতি ইমান আনয়ন করে, তারা মুসলমান। তারা আত্মাহর অনুগত বলে পরিচিত হয়। আর যারা অমান্য করে তাদের বলা হয় কাফের। এ মহান ধর্মের অনুসরণকারী মুসলমান তাইয়েরা মুনিয়ের মানুষকে অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাদেরই একদল আমাদের রাজ্যেও এসে পৌছে গেছেন। আমাদের সাবেক রাজা গোবিন্দজী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাজিত ও নিহত হয়েছেন। কিন্তু বিরুদ্ধদল পরাজিতদের প্রতি কোন অত্যাচার করেননি। বরং দরদ, ভালবাসা ও মমতা নিয়ে সকলকেই কাছে টেনে নিয়েছেন। আমরা সে ধর্ম গ্রহণ করে শান্তির পথ বুঝে নিয়েছি।”

কমল বলল, “দাদা! আপনার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন বহদিন থেকে এই সত্য জিনিসটির জন্মই অপেক্ষা করেছিলাম। আমার মন বলছে, সৃষ্টির ধর্ম কর্তনও মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষ মানুষের তাই। আর একমাত্র সৃষ্টাই তাদের মনিব। একথা আমি বহদিন থেকে মনে মনে বিশ্বাস করে আসছি। আপনি আমাকেও ঐ মহান ধর্মে শাসিত করে নিনু।”

মাধব বলল, “বাবা! আমি একদল এক ভগবানের মূর্তি তৈরী করেছিলাম। ঐ মূর্তিকে আমি নিরাকার, নিরপেক্ষ, দয়ালু ও সদাঙ্গ্রত ভগবানরূপে কল্পনা করেছিলাম। আমি তাঁর মন্দির স্থাপন করে সকলের জন্য সে মন্দির উন্মুক্ত করে দেয়ার কথাও ভাবতাম। পাঁচ কাক আমাকে সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিরাকার, নিরপেক্ষ ও দয়ালু সৃষ্টির মূর্তি তৈরী করার কোন দরকার নেই। তাঁর সৃষ্টি আকাশ-বাতাস, গাছ-পালা, নদী-স্রোত তাঁরই মহিমা প্রচার করছে। এসব নিদর্শন দেখে তার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করাই যথেষ্ট। কোন সেবমূর্তি গড়ার প্রয়োজন নেই। পাঁচ কাকার উপদেশে আমি ঐ মূর্তি পুড়া থেকে বিরত হয়েছিলাম। আজ আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমার কল্পনার ভিলবানই আত্মাহররূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং মন্দির সেই মহাপুরুষের মুখ দিয়ে নিজের পরিচয় জানিয়ে দিয়েছেন। বাবা! আমিও মহান আত্মাহ ও তাঁর প্রেরিত দূতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম।”

রনবীর পক্ষের মনোযোগ সহকারে আলোচনা শুনছিল। সে এবার বলল, “বাবা! আপনি জানেন, আমি মাধব, শান্তা, তেজু, লালু ও পাঁচুকে মানুষ বিবেচনা করে এসেছি। কিন্তু আমাদের ধর্ম তাদের মর্বাদা বীকার করে না। তাই এ ধর্মই ছেড়ে আমি মানবতাবিক সফল করে বনবাসী হয়েছি। আজ আপনার নিকট মানব ধর্মের সন্ধান পেলাম। বাবা! আমি পূর্ব থেকেই মনে মনে এ ধর্মের অনুসারী হয়ে আছি। আমিও আজ



থেকে মুসলমান।”

মোহিনী মায়ের কাছে দাড়িয়ে আছে। জাহানারা গ্রেহের কন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কন্যাকে দেখে যেন তার মনের আশ মিটছে না। এবার মোহিনী কথা বলল। সে আবদুর রহমানকে লক্ষ্য করেই বলল, “কাকা! আজ আমার বড়ই খুশীর দিন। আজ সবাইকে আমি এক সঙ্গে পেয়েছি। সেদিন আপনাদের সকলকে ছেড়ে অস্বাভাবিক সময় তেবেছিলাম, হয়ত চিরজীবনের জন্যই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েগেল। (যে) আত্মাহুর দয়ায় আজ আমরা পুনরায় মিলিত হ’ছি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একমাত্র উপায়ই হচ্ছে পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করা। মায়ের নিকট থেকে আমি ইতিমধ্যেই অনেক কিছু জেনে নিয়েছি। আমি আপনাদের সকলকে সাক্ষী রেখে বলছি, লা-ইলাহা ইল্লাহা মুহাম্মাদুর রসূলুলাহ।”-

উপস্থিত অন্যান্যদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণের সংকল্প প্রকাশ করল। রাত গভীর হতে দেখে আবদুর রহমানের নেতৃত্বে আবদুর রহীম ও সুলতান এশার নামাজ শেষ করে পুনরায় বসল এবং সকলকে কলেমা পড়িয়ে ইচ্ছামতে শিক্ষাদান করল। ইসলাম গ্রহণের পর সকলের নাম পরিবর্তন করা হল। কমলের নাম হল জোহরা খাতুন, মাধব মাহবুবুল আলম, রনবীর মুজাহিদুল ইসলাম, শান্তা-আমিনা খাতুন, মোহিনী-হাসিনা খাতুন, তেজু-তাজুল ইসলাম, আর লালুর নাম রাখা হল লুৎফুর রহমান।

বস্তির লোকেরা দাবী করল যে, তাদের ছেড়ে মুজাহিদ এবং মাহবুব শহরে চলে যেতে পারবে না। এখানে সরদারের কাজ চাষ্যনোর যোগ্য লোক নেই। তাছাড়া ইসলামের শিক্ষাদান করার জন্যও উপযুক্ত লোকের দরকার।

রনবীর বলল, “আমি তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাব না ভাই। ইসলামেরই বিষয়ে আরও বেশী জ্ঞান লাভ করে শীগগীর আমি ফিরে আসব এবং তোমাদের সঙ্গে নিয়ে আত্মাহুর জমিনে চারদিকে ঘুরে ফিরে মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আত্মাহুর বান্দায় পরিণত করার চেষ্টা করিয়ে যাব। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার ভাই হাবিব সরদারের দায়িত্ব পালন করবে। মহান আত্মাহুর দরবারে মুনাজাতের পর সভা শেষ হল। [www.banglabookpdf.blogspot.com](http://www.banglabookpdf.blogspot.com)

পরের দিন ফজর নামাজের পর আবদুর রহমানের নেতৃত্বে আবদুর রহীম, জাহানারা, জোহরা, আমিনা, হাসিনা, মুজাহিদ এবং মাহবুব শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। বন জংগলের অধিবাসী নবদীক্ষিত মুসলমানেরা তাদের বিদায় সম্বর্ধনা জানানোর জন্য বহুদূর পর্যন্ত পেছনে পেছনে এসে এই অস্তিত্বাত্মিক দলটিকে সূর্যোদয়ের পথে এগিয়ে দিল।